মধুচাঁদের মাস

প্রবোধকুমার সান্যাল

মিত্র ও ঘোষ
১০ নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

মধুচাঁদের মাস

প্রথম সংস্করণ. ফাল্গুন—১৩৫

—আড়াই টাকা—

মিত্র ও ঘোষ ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীসুমথনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও ভারত সংস্কৃতি ভবন প্রেস ১০, করিস চার্চ লেন,
কলিকাতা হইতে শ্রীশ্যামসুন্দর সিকদার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

৺বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্মরণে—

"একসাথে পথে যেতে যেতে

রজনীর আড়ালেতে

তুমি গেলে থামি—"

প্রবোধকুমার সান্যাল
প্রণীত

—গল্প সংগ্রহ—

শ্রেষ্ঠ গল্প—
অঙ্গরাগ—
এই যুদ্ধ—
যত দূর যাই—
প্রঞ্চতীর্থ—
আদি ও অকৃত্রিম—
চেনা ও জানা—
বন্যাসঙ্গিনী—
তরঙ্গ—
কল্লান্ত—
নীচেরতলায়—
লালরঙ্—

—ভ্রমণ কাহিনী—

দেশ-দেশান্তর—
ভ্রমণ ও কাহিনী—
অরণ্যপথ—
ইতস্তত:—
পাঞ্জাব সীমান্তের পথে—

—উপন্যাস—

জীবনমৃত্যু—
শ্যামলীর স্বপ্ন—
কাজললতা—
স্বাগতম্—
স্বরলরেখা—
জয়ন্ত—
আঁকাবাঁকা—
জলকল্লোল—
নদ ও নদী—
সায়াহ্ন—
দেবীর দেশের মেয়ে—
নববোধন—
অগ্রগামী—
ঝড়ের সঙ্কেত—
আলো আর আগুন—
উত্তরকাল—

—চিত্র—

আগ্নেয়গিরি—
রঙীনসুতো—

—ছোটদের—

শুকনোপাতা—
সত্যি বলছি—
ওপারের দূত—
আমার কথাটি ফুরোলো—
দুরাশার ডাক—
ছোটদের মহাপ্রস্থানের পথে—

—প্রবন্ধ—

মনে মনে—
পায়ে হাঁটা পথ—

—নাটক—

মল্লিকা

মধুচাঁদের মাস
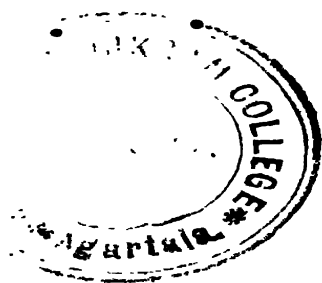
কথা বলতে চাইলো না; চুপ ক'রে শুয়ে রইলো পাশ ফেরে। মুখ থেকে কিছু একটা উচ্চারণ করতেও যেন অসীম ক্লান্তি।

কিসের শব্দ বলো ত?

কই?—বাসন্তী একবার যেন কান পেতে শোনে।

ওই যে সাঁ সাঁ করছে! ঝড়ের শব্দ কি?

না। হাওয়া লাগছে নারকেল গাছের পাতায়। কানে আঙ্গুল দাও, অন্ধকার সাঁ সাঁ করবে। রাবণের চিতা, জানো ত, জল্‌ছে চিরকাল!

তোমার কি জ্বর এখনো ছাড়েনি?—হিরণ্য জানতে চাইলো।

ছাড়বে, একটুও থাকবেনা জেনে রেখো।—বাসন্তী ফুঁপিয়ে ওঠে।

কেন বলো ত? একটু একটু জ্বর, একটু একটু কাশি, ভরসন্ধ্যায় আঠা আঠা ঘাম, চোখের কোণে কালি, সারাদিনের ক্লান্তি!

ভালো থাকি শেষ রাত্রে, বাসন্তী বলে, যখন সব চেয়ে অন্ধকার—ঠিক আলো ফোটার আগে।

কেন বলো ত? এ উপসর্গগুলো ভালো নয়, তা জানো?

মাসচারেক পরে হিরণ্য যেন সজাগ হয়ে ওঠে। বলে, না, এ ভালো নয়, সুরেন ডাক্তারকে দেখানো দরকার। শনিবারে আপিস থেকে ফিরেই নিয়ে যাবো।

বাসন্তী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। পরে বললে, মুন্নুর রক্ত-আমাশার জন্য এ মাসে পনেরো টাকা খরচ হয়েছে তা জানো? কাল থেকে ও কি খাবে জেনে এসো।

তুটি দই-ভাত দিলে হয় না? কিন্তু দইয়ের দাম যে অনেক!

ভাত? আর নয়! অত কাঁকর ওর পেটে আর সইবে না।

হিরণ্য চুপ করে রইলো। অখণ্ড শান্তি, যতটুকু রাত বাকি থাকে। সকাল মানে সমস্যা। দেড় বছরের নাটু জ্বরে ভুগছে সতেরো দিন। দুধের গুঁড়ো পাওয়া যেতো বাজারে দেড় টাকায় এক শিশি, এখন আরো চড়া। পুজো না এলে সারা বছরে কাপড়-জামার কথা ওঠে না। মেজমেয়েটা কান্না নেয় সারাদিন,—কেননা তার পেট ভরে না। চিঁড়ে-মুড়ির দর দেড় টাকা, আটা-ময়দা মানে তেঁতুলবিচি! বড় ছেলেটার পড়াশুনো বন্ধ। কয়লা আনতে ছোটে দু'মাইল দূরে, রেশন্ আনতে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে একবেলা, পড়তি বাজারে গিয়ে আধমরা সব্জি আর দোরসা চুনোচিংড়ি আনে। ইদানীং সংসর্গ তার ভালো নয়।

ঘুম আসছে একটু?

না গো।

এবারে বোধ হয় মাইনে পেতে দিন দুই দেরি হবে।

বাসন্তীর চোখ জ্বালা করে শেষ রাত্রে, চোখের কোণ মোছে বার বার। বললে, কেন?

ধর্মঘট! 'মাইনে বাড়তেও পারে, চাকরিও যেতে পারে।

কিন্তু রেশন্ আর বাড়ীভাড়া? হাতখরচ?

হিরণ্য চুপ ক'রে চেয়ে থাকে। ভোরের আগে এখন সবচেয়ে বেশি অন্ধকার, ঘন নিগূঢ় রুদ্ধশ্বাস। সুবিধা এই, পাঁচ ছয়টি ছেলেপুলে সবাই খায় না,—জন দুই প্রায়ই থাকে বিছানায়। বাসন্তীর কোন খাইখরচ নেই, নারীজীবন ছাড়া আর কোনো জীবনের কথাও সে জানে না, এই সুবিধা। হিরণ্য চেনে একটা রাস্তা—যে রাস্তাটায় আপিস, মুদির দোকান আর

ডাক্তারের বাড়ী। ওই পথটা ধ'রেই যাওয়া যায় মা-গঙ্গার দিকে—যেদিকে শ্মশান। শ্মশান কি সুন্দর! বাঁধানো সিঁড়ি নেমে গেছে গেরুয়া-গঙ্গার একেবারে গর্ভে। বটের ঝুরি নেমেছে জলে, বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যায় মন, আর চিতার ধোঁয়ার কী অদ্ভুত জীবনোত্তর গন্ধ! কী উদাসী হাওয়ার স্বাদ করুণ বৈরাগ্যের।

হিরণ্য হাতখানা বাড়ালো।

কী দেখছ?

দেখছি তোমার কপাল। বোধ হয় জ্বর নেই, একটু ঘাম—

বাসন্তীর চোখ আবার জ্বালা করে এলো।

নাসপাতি খেতে ইচ্ছে ক'রে?

না।

পাকা খেজুর?

বাসন্তী বললে, তোমার চোখে ঘুম নেই কেন?

হিরণ্য বললে, ঘুম ছিল বছর বারো আগে—যখন বিয়ে করিনি। ঘুমোতে পারতুম, যদি এ যুগে ছয়টি সন্তান না হোতো।

বাসন্তী বললে, ভয় পেয়ো না।

পাবো না? কেন?

সবগুলো টিঁকবে না, এই ভরসা।

হিরণ্যর গলার কাছে একটা পিণ্ড উঠে এলো, ঢোক গিলে সে আবার সেটাকে নামিয়ে দিল। বুকচাপা দেড়খানা ঘর, দেয়ালগুলো কালিঝুলি মাখা,—দিনের বেলাতেও সেখানে যেন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। ওরই মধ্যে রান্না, ধোঁয়া থাকে সারাদিন। পুরনো বিছানার দুর্গন্ধ, ময়লা গৃহসজ্জায় ঠাসা ঘর। তক্তার নীচে শোয় দুটো শিশু,—সারারাত মশার কামড়ে ছটফট করে।

মেজমেয়েটা রাত্রে চেঁচায় কৃমিরোগে। বড় ছেলেমেয়ে দুটো ছেঁড়া মাদুর হাতে নিয়ে ঘোরে রাত্রের দিকে,—ওপাশের ভাড়াটের একফালি বারান্দায় অবশেষে রাত কাটাবার জায়গা খুঁজে পায়। ঘুমিয়ে পড়লে বাসন্তী আর ডাকে না, খাবারটা বাঁচে পরের দিন সকালের জন্য।

এবার এ বাড়ীটা ছেড়ে দিতেই হবে, আর কুলোচ্ছে না।

বাসন্তী কথা বলে না। এবার আলো ফুটবে, এবারে তা'র সারা-দিনের মতো অবসাদ দেখা দেবে। বোধ হয় সে চোখ বুজে থাকে।

পনেরো টাকায় কেউ এ ঘরে থাকতো না, বাড়ীওলা চাইছে পঞ্চাশ। তার ওপর চায় বেনামীতে সেলামী। এই গোয়ালের ভাড়া পঞ্চাশ? ঠুকুক না নালিশ, কে দিচ্ছে টাকা?

বাসন্তী চুপ করে থাকে।

হিরণ্য বললে, তুমি বাপের বাড়ীর চিঠি পেয়েছ?

না।

ওরা আর আমাদের খোঁজ নেয় না কেন বলো ত?

বাসন্তী বললে, নতুন কয়লাখনির মালিক, তাই জন্যে!

হোক না বড়লোক, আমি ত জামাই!

আমি গরীবের বউ। সম্মান নেই!

হিরণ্য উষ্ণ হয়ে বললে, চোরাবাজারে কয়লা বেচলে কি এতই সম্মান পাওয়া যায়?

বাসন্তী বললে, সম্মানের চেয়ে টাকা অনেক বড়!

মনুষ্যত্বের চেয়েও?

[illegible]।

একটু একটু জ্বর, তা'র সঙ্গে একটু একটু কাশি।' সামান্য জ্বর ওঠে ভরসন্ধ্যাবেলা, আঠা আঠা ঘাম। জ্বর ছাড়ে শেষরাত্রে। তারপর সারাদিন অবসাদ, চোখের কোণে কালি।

কলমটা রেখে বেলা ঠিক পাঁচটায় হিরণ্য আপিস থেকে বেরিয়ে পড়ে। পিছন থেকে কে যেন তাড়া করে, সামনের পথে কে যেন তাকে ভয় দেখায়। ভয় পেয়ে সে বাজারে ছোটে। তা'র পাশের চেয়ারের অমূল্য,—অমূল্যর কাছে এ মাস অবধি চৌদ্দ টাকা ধার। আজও নিল দু'টাকা। হিরণ্য ছোটে বাজারের দিকে। আঙুরের সের পাঁচ টাকা, পাঁচ আনায় একটা নাসপাতি। একটি ডালিমের পাঁচ ছটাক ওজন দেখলে শরীর আড়ষ্ট হয়,—দাম তা'র সাড়ে বারো আনা। হয়ত এক পয়সায় দুটি দানা। এর চেয়ে ভালো ঘি কেনা—যদি ঘি থাকে আজ ভূভারতে। ঘিয়ের চেয়ে ভালো দুধ, কিন্তু জল বিক্রি শাদা রঙের। যাক্, আঙুর-নাসপাতিতে ভেজাল নেই, মুড়ি আর শশায় বিষ মেশাতে পারেনি এখনও ব্যবসায়ীরা।

হিরণ্য ছুটোছুটি করে বাজারে ঢুকে। বাসন্তীকে খাওয়ানো চাই সব চেয়ে যা ভালো। বাসন্তী মানে ছয়টা শিশুর প্রাত্যহিক প্রাণধারণ, বাসন্তী মানে রান্না, বাসন মাজা, ময়লা কাচা, বাসন্তী মানে ঘরকন্নার শৃঙ্খলা। না, আরো কিছু। বাসন্তীর আসল মানে হোলো হিরণ্যর অস্তিত্ব। বাসন্তী এমন একটা আশ্রয়, যার নীচে দাঁড়ালে অসীম নিরুদ্বেগ।

দু'টাকায় দু'দিনের ফল খাওয়ানো। কিন্তু তৃতীয় দিন? হিরণ্য একবার থমকে দাঁড়ায়। হাতের মুঠোয় গোলাপী রঙের একখানা দু'টাকার নোট, বিয়ের দিনে বাসন্তীর গালের রঙ ছিল এমনি,—এ নোটখানা এখনি যাবে শুকনো ফল কিনতে গিয়ে। অমূল্যর কাছে আর ধার পাওয়া যাবে না। মাসকাবারের অনেক দেরী। হিরণ্য থমকে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক

তাকায়। মুন্নুর রক্ত-আমাশয় আজও সারেনি, নাটুর জ্বর তিন সপ্তাহ, মেজমেয়েটা ভুগছে অনেককাল। এ দু'টাকার মধ্যে তাদেরও দাবী আছে ছোট ছোট। তাদের সামনে রেখে বাসন্তী খাবে না আঙ্গুর, নাসপাতি আর ডালিম। তারা শুকোবে আর বাসন্তী খাবে দুধ? তাদের মাঝখানে ব'সে কি বাসন্তী চিবোবে গাওয়া ঘিয়ে ভাজা লুচি?

কিচ্ছু কেনা হলো না। হিরণ্য ফিরলো। সেই ভালো, এ টাকা দেবে সে বাসন্তীর হাতে। যেমন সে দিয়ে এসেছে সব,—তা'র জীবন, তা'র ভালো-মন্দ, তা'র বর্তমান ভবিষ্যৎ। হিরণ্য ফিরে চললো।

দেখতে পাচ্ছে এখান থেকে ঘরখানা অন্ধকার,—কিছু ধোঁয়া, কিছু ছায়া, কিছু ভয়, কিছু বা নৈরাশ্য। ওর মধ্যে কান্না নিয়েছে দু'তিনটে, ময়লা বিছানায় পড়ে আছে দু'তিনটে—প্রত্যেকটিই অবাঞ্ছিত। একপাশে অসংখ্য ওষুধের শিশি, অন্যপাশে ঘুঁটে আর কয়লার স্তূপ। কালিঝুলি-তেল মাখা রান্নার কড়া, ফুটো এলুমিনিয়মের হাঁড়ি, কলাইয়ের চটা ওঠা বাটি, ভাঙ্গা কাঁচের পেয়ালা। ওরই মধ্যে আছে বাসন্তীর হাতের কলাকৌশল, আছে তার পরিচ্ছন্নতার স্পর্শ, আছে তার সৌন্দর্যবোধের চিহ্ন। বাসন্তী ভালোই লেখাপড়া শিখেছিল বাপের বাড়ীতে।

তবু হঠাৎ সে কেন ছিটকে এলো হিরণ্যর ঘরে! চালচুলো নেই, জমিজমা নেই, পরিবার গোষ্ঠি নেই,—শুধু চাকরির ভরসায় বউ আনা ঘরে? কে জানতো বারো বছরে ছয়টা ছেলেমেয়ে? কেই বা জানত দুর্ভিক্ষ, বিপ্লব, মহামারী, যুদ্ধ? জানতো কি কেউ পনেরো টাকার কাপড়, আর তিরিশ টাকার চা'ল? কেউ কি ভেবেছিল মাছের দাম চার টাকা, আর ডিমের জোড়া পাঁচ আনা? কেউ কি জেনেছিল স্বাধীন ভারতে অনেক বেশী দুঃখ বাড়বে? ঘরে ঘরে অভিশাপ প্রতিধ্বনিত? প্রাণে প্রাণে ধূমায়িত

অসন্তোষ? একথা সত্যি, বারো বছর আগে বাসন্তীর বাবা কয়লা-খনির মালিক ছিলেন না—থাকলে কি আর বাসন্তীর সঙ্গে হিরণ্যর বিয়ে হতে পারতো?

ঘরে ঢুকতেই বাসন্তী বললে, গিয়েছিলে আজ?

কোথায়?

বাসন্তী আর কোন কথা বললে না, কেবল হিরণ্যর পায়ের জুতো জোড়াটা মুছে তুলে রেখে দিল। পরে বললে, ওষুধ এনেছ?

হিরণ্য বললে, ওষুধ? কই না?

তবে এত দেরী হোলো যে?

ওঃ—হিরণ্য জবার দিল, ভুলেই গেছি, সুরেন ডাক্তারের ওখানে যাবার কথা ছিল বটে। কিন্তু, অনেকদিন পরে, আজ একটু মাঠে গিয়ে বসেছিলুম।

বাসন্তী থমকে দাঁড়ালো। বললে, মাঠে? কোন্ মাঠে? কলকাতায় মাঠ কোথায়?

গলার মধ্যে যেন তা'র কান্না, চোখে আগুনের জ্বালা! মাঠ মানে মুক্তি, মাঠ মানে পলায়ন—সে জানে। ধোঁয়ার থেকে মুক্তি, বিষাক্ত বাষ্পের থেকে ছুটে পালানো। বিয়ে মানে সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের চক্রান্ত এ কথা কি সে জানতো? সে কি জানতো স্নেহমোহবন্ধনের এই বীভৎসতা? সতীধর্মের নাগপাশ?

অনেকবার সুরেন ডাক্তারের কাছে যাবার কথা হয়েছে। কিন্তু হিরণ্যর সাহস হয়নি যাবার। গেলেই ওষুধের ফর্দ। দোকানে দোকানে দামী ওষুধ খুঁজে বেড়ানো,—অবশেষে চোরাবাজারে গিয়ে পাঁচগুণ দামে কেনা। সে-ওষুধ আনা মানে রেশনের টাকা ফুরানো, বাজার খরচ বন্ধ,

শিশুদের পথ্যের অভাব। সুরেন ডাক্তার দুধ খেতে বলবে—সেটা ভয়ের কথা। বলবে গাওয়া ঘিয়ের লুচি, বলবে হয়ত ডিমসিদ্ধ আর মাখন-রুটি,—অর্থাৎ দুর্ভাবনা বাড়িয়ে দেবে। কিছু না হয় ত' বলবে, বিদেশে নিয়ে যান্, কোনো ফাঁকা মাঠের মাঝখানে, কিম্বা পাহাড়ের ধারে—যার তলা দিয়ে বয়ে যায় স্বচ্ছ ঝরণার ধারা। দুই ধারে শ্যামল প্রান্তর, মধুর সূর্য-রশ্মি, অবগাহন করো অবারিত মুক্তির সমুদ্রে। হিরণ্য ভয় পায় সেই লোভাকুলতায়। কোথা যাবে সে ছয়টি সন্তানকে নিয়ে? কত রাহাখরচ? কোথায় পাবে বিদেশে থাকার সেই জায়গা? আপিসের ছুটি ক'দিনের? আবার কি সে নতুন দেনা ঘাড়ে নেবে?

ঘরের মধ্যে হারিকেনের আলোটা স্তিমিত, হয়ত আজ কেরোসিন আনা হয়নি। চিমনীটা ফাটা, কাগজের আঠা দিয়ে জোড়া। কিন্তু সেই আলোয় ঘর যেন আরো অস্পষ্ট। এর চেয়ে ভালো আলো না থাকা। বরং শান্ত অন্ধকার ভালো, বরং ভালো বুকচাপা অন্ধতা। কিছু দেখতেও চাইনে, কিছু দেখতেও পাইনে। হোক মৃত্যু মানবতার, হোক ধ্বংস দেবত্বের,—চোখের আড়ালে ঘটুক সব। অন্ধকার থাকলে ত' আলোর খরচটাও বাঁচে। বাঁচে দেশালাইর খরচ,—উপরে লেখা দুই পয়সা, কিনতে গেলে এক আনা। কর্তৃপক্ষের অযোগ্যতা ধরাতে যাও, বলবে,—দেশদ্রোহী! অভিযোগ জানাতে যাও, বলবে—শিশুরাষ্ট্র!

রাস্তার থেকে আলোর চিল্‌তে আসে ঘরে, ওতেই কাজ হয়। ছেলেমেয়েরা যথেষ্ট দুরন্ত নয়, কেননা জীবনীশক্তি কম। উৎপাতের মধ্যে শুধু কাঁদে আর বায়না ধরে। কিছু না পেয়ে নেতিয়ে পড়ে এক সময়ে। বাসন্তী টেনে টেনে তাদেরকে খাইয়ে দেয়। কী খাওয়ায়, অন্ধকারে দেখা যায় না—এই সুবিধা। বড় মেয়েটা জেগে থাকে

হিরণ্যর না ফেরা পর্যন্ত,—যদি কিছু আনে মুখে দেবার মতো। কিন্তু হিরণ্যর খালি হাত দেখে অবশেষে সে চোখ বোজে। ক্ষীণদৃষ্টি তার একসময়ে সিক্ত হয়ে ওঠে। বাকি ছেলেমেয়েগুলো আছে কোথাও অন্ধকার ঘরের এখানে ওখানে। বাসন্তীও তাদের পাশে অপরিসীম ক্লান্তি নিয়ে আঁচল পেতে শোয়। হিরণ্য দরজার ধারে কাৎ হয়ে ব'সে থাকে। ব'সে ব'সে কী যেন সে ভাবে দীর্ঘকাল। খেতে চাইবে সে অনেক রাত্রে, যখন ঘুম ছাড়া আর কিছু থাকবে না।

বাসন্তী এক সময় নিজের কপালটা টিপে দেখে। জ্বর এসেছে চুপে চুপে। তা'র সঙ্গে আঠা আঠা ঘাম।

স্বরেন ডাক্তারের কাছে অবশেষে একদিন যেতেই হোলো।— দু'টাকা তিনি নেন, পরীক্ষা করেন সযত্নে। তাঁর চেম্বার ঠিক এ পাড়ার চৌমাথার কোণে,—ছোটখাটো অনেকগুলো পথ যেখানে মিলেছে। ডাক্তারের চেম্বার এখানে হওয়াই দরকার। উর্ণনাভ জাল ফাঁদে ঠিকআলোর ফাটলের মুখে, যেখানে ছোটখাটো কীটপতঙ্গের অবিরাম আনাগোনা।

বাসন্তীকে পরীক্ষা ক'রে ডাক্তার মুখ গম্ভীর করলেন। বললেন, আরো কিছুদিন আগে আনা উচিত ছিল।

কেন বলুন ত ?—কেঁপে উঠলো হিরণ্য।

ডাক্তার বললেন, এক্স-রে হয়ে গেছে কি ?

আজ্ঞে না।

এর আগে কোনো ওষুধ ?

এক শিশিও না।

অনেকদিন ধ'রে এর চিকিৎসা করা চাই, বুঝতে পাচ্ছেন ?

হিরণ্য প্রশ্ন করলো ভয়ে ভয়ে, অসুখটা কি ?

সুরেন ডাক্তার তাঁ'র মুখের দিকে চেয়ে হাসলেন। হিরণ্য ভরিয়ে উঠলো। তারপর অনেকগুলো ওষুধের ফর্দ আর পথ্যের হিসেব নিয়ে দু'জনে ফিরে এলো।

হঠাৎ অনেকদিন পরে খিল খুলে যায় বাসন্তীর মনের। এলোমেলো আলো এসে পড়ে। বাঁধনের বাইরে দেখতে পায় জীবনের একটা নতুন ব্যাখ্যা। বাঁচবার জন্য দূরের থেকে যেন একটা ডাক আসে ; জলের তলায়-তলায় যেমন আসে বন্যার সাড়া। এ জীবনটা সত্য নয়, যেটা সে পায়নি সেটাই বড়। বন্ধনের থেকে সর্বাঙ্গীণ মুক্তি, সেই জীবনটা। কোনো সন্তানের স্নেহ পৌঁছবেনা সেখানে, না পাশবিক মোহ, শৃঙ্খলের ঝঙ্কার শোনা যাবেনা পায়ে পায়ে,—সেই অবারিত আত্মিক মুক্তি। সে কি কোনো অপরাধ করেছিল ? বিবাহ মানে কি পুরুষের বশ্যতা স্বীকার ? শুধু কি সন্তানধারণের চক্রান্ত ? দুর্ভাগ্যের আমন্ত্রণ ?

তা'র ডাক নাম ছিল মাধু, স্বামীর ঘরে এসে বাসন্তী। সেই মাধুকে ফিরিয়ে আনা চাই,—নিঃসংস্কার নিষ্কলঙ্ক মাধু। মধুমাসে তার জন্ম, ফুল ফোটার মাস। মেধাবতী ছাত্রী ছিল সে। আদরের নাম ছিল বাসন্তী। আদর তা'র ফুরিয়েছে, এখন আসুক ফিরে মাধু। মাধু এসে দাঁড়াক বাসন্তীর চিতাভস্ম মেখে।

জ্বর হোক তা'র একটু একটু, জরা না এলেই হোলো। কত লোক যায় পথ দিয়ে কত লক্ষ্য নিয়ে। আছে দুর্গত দারিদ্র্যের বাইরে একটা মহাজীবন, সেই ক্ষুধা বাসন্তী ভুলেছিল, মাধু ভোলেনি। আছে আনন্দ, সজীব চোখে তাকে চিনে নিতে হবে। দেশ নাকি স্বাধীন, কাজ নাকি তার অনেক। পুরনো খবরের কাগজ প'ড়ে সে জেনেছে, তারই মতো

অনেক সামান্য মেয়ে হয়ে উঠেছে মহীয়সী। জন্তু থাকে গুহায়, অরণ্যের ছায়ায়, লোকচক্ষের অন্তরালে। মানুষ থাকে বাইরে, মুক্তির মাঝখানে, লোকযাত্রার কোলাহলের কেন্দ্রে। এই দিনানুদৈনিক অতৃপ্তি আর অসন্তোষে বাসন্তীর হোক অপমৃত্যু, মাধুকে উঠতে হবে এর থেকে। পিছন থেকে টান পড়লে চলবেনা, মাধুর পিছনের আকর্ষণ নেই। সতীত্বের স্তব করেছে পুরুষ, মাতৃত্বের বন্দনা করেছে সমাজ,—তা'র ফাঁদে ধরা দিয়েছিল বাসন্তী, সেই ফাঁদ ডিঙিয়ে যাবে মাধু। কেননা নারীত্বের আজ আহ্বান এসেছে রাষ্ট্রের থেকে। আজ পূজা পাবে মেয়েরা,—মায়েরাও নয়, সতীরাও নয়।

অপরাধ কিছু নেই হিরণ্যর,—দারিদ্র্য অপরাধ নয়। সে হ'তে পারতো পুরুষ, কিন্তু হয়ে উঠলো শুধু জনক। সেও ফাঁদে পড়ে আঁকুপাঁকু করছে, বন্ধনজর্জর সে। ঘুমন্ত পুরুষের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো শুধু স্বামী,—প্রেমিক, স্বার্থত্যাগী, দুঃখভোগী। তা'র চোখে আশা নেই, আশ্বাস নেই, আনন্দ নেই,—সে শুধু পিতা শুধু স্বামী গৃহগতপ্রাণ প্রতিপালক সে। তার বাইরে যে পুরুষ,—সে শুয়ে রয়েছে মহানিদ্রায়। সে আত্মবিক্রয় করলো বাসন্তীর কাছে,—মাধু রইলো তা'র চোখে কবিকল্পনা; বাসন্তী ক্রীতদাসী হয়ে রয়ে গেল হিরণ্যর পায়ের তলায়, কিন্তু মাধু রয়ে গেল তপস্বিনী অপর্ণা।

চোখের জলে বাসন্তীর আঁচল ভিজে গেল।

মুক্তি? কি প্রকার চেহারা তা'র? আছে কি তা'র কোনো চেনা পথ? আছে কোনো নিশানা? পিঞ্জরের পাখী আকাশের দিকে ফিরে গান ধরে; কিন্তু শূন্যে তাকে উড়িয়ে দাও—অনন্ত উদার গগনে সে পথ খুঁজে পাবে না, আবার এসে ঢুকবে সেই পিঞ্জরে। মুক্তি হোলো তা'র ক্ষুধামাত্র কিন্তু মনে মনে মুক্তি তা'র কোথা? পথচারিণী মেয়েরা কলহাস্যে কেমন ক'রে হেঁটে যায় পথ দিয়ে? কেমন করে বৈমানিক উড়ে যায় আকাশপথে?

কেমন করে নাবিক ভেসে যায় সমুদ্রলোকে ? পথের প্রত্যেকটি মেয়ে যেন বাসন্তীরই বাসনা বহন ক'রে চ'লে যায়,—ওরা যেন তারই ছোট ছোট মুক্তিপিপাসা ; ওদেরই সঙ্গে ছুটে চলে মাধু, ওদেরই মতো স্বচ্ছন্দ কণ্ঠে ডাক দিয়ে যায়। আজকে মাধু যেন আর বাসন্তীকে স্থির থাকতে দেয় না। আকাশের মাধু পিঞ্জরের বাসন্তীকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

অমূল্য বললে, ধার ক'রে কদ্দিন চালাবি ?

হিরণ্য জবাব দেয়, আয়ু যদ্দিন।

শুধবি কি দিয়ে ? বাড়ী, গয়না, বীমা, জমি—আছে কিছু ?

চাকরি দিয়ে শোধ করবো।—হিরণ্য ফুঁপিয়ে ওঠে।

অমূল্য বললে, মাইনে পাস একশো কুড়ি, বাড়ী নিয়ে যাস তিয়াত্তর টাকা। বাড়ীভাড়া, মুদি, রেশন, ওষুধ—থাকে কিছু তোর ?

হিরণ্যর গলার মধ্যে একটা ঢেউ জমে ওঠে। বললে, কিন্তু টাকা যে চাই!

ডাক্তার কি বললে ?

আমার মন যা বলছে ত'ার চেয়ে বেশী কিছু বলেনি।

অমূল্য অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললে, তোর কি মনে হয়, বাঁচবার কি কোনো আশা নেই ?

হিরণ্য ককিয়ে উঠলো, কা'র কথা বলছিস ?

বলছি তোর, আমার, তা'র—আপিসে যত লোক আছে তাদের সকলের।

ওঃ তাই বল্—আশ্বস্ত হয়ে হিরণ্য চেয়ার টেনে বসলো। আজকে সবাই এক সঙ্গেই মৃত্যুমুখী এইটে যেন তার সান্ত্বনা। সবাই যদি মরে, সেই ত' আশীর্বাদ। হঠাৎ সর্বব্যাপী ভূমিকম্প, দেশব্যাপী বন্যার জলোচ্ছ্বাস,—

কিম্বা ওই আজকের একটি সর্বনাশা আণবিক বোমা, একই সঙ্গে সকল সমস্যার চরম প্রতিকার। কেউ বাঁচবে না, এই আনন্দ হিরণ্যর। পাছে কেউ বাঁচে, এই ভয় তার।

অমূল্য বললে, এর প্রতিকার কি জানিস?

কি?

কাগজপত্রগুলো সরিয়ে দিয়ে অমূল্য বললে, কি বল্‌তো?

হিরণ্যর বিদ্যা দৈনিক সংবাদপত্র পর্যন্ত। সে ভাবলো গৃহযুদ্ধ, ধনী-হত্যা, বিপ্লব—বড়জোর আক্রমণ শাসনশক্তিকে—যারা আশ্বাস দিয়ে এসেছে এতকাল, যাদের প্রতিজ্ঞা ছিল স্বর্গসুখের, যারা রটিয়েছিল দুধ আর মধু গড়িয়ে যাবে স্বাধীন ভারতে।

শোন্—অমূল্য বললে, এর প্রতিকার হোলো মাইনে বাড়ানো, আর জিনিসের দাম কমানো। এটা বাড়বে, ওটা কমবে—নৈলে আশা নেই। শোন্, আর একবার ধর্মঘট করবি?

যদি চাকরি যায়? যদি আপিস উঠে যায়?—হিরণ্য প্রতিবাদ জানালো।

বিড়ি ধরিয়ে অমূল্য বললে, তারও ব্যবস্থা আছে মনে রাখিস। কেবল একটু সাহস, একটু জিদ। দেখছিসনে অসন্তোষে সব ভ'রে যাচ্ছে, সবাই মারমুখী,—এখন শুধু একটা ফিন্‌কি, ব্যস, আর দেখতে হবে না!

অমূল্যর কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে হিরণ্য সেদিন বেরিয়ে পড়লো। অর্থনীতিশাস্ত্র অতটা তা'র জানা নেই, জানা নেই ধর্মঘটের শেষ ফলাফল। অমূল্যর কথাগুলো তার কানে বাজে। অসন্তোষ তা'র মনে, সন্দেহ নেই। মাঝে মাঝে মনে হয় তা'র ওই সঙ্কীর্ণ ঘরের দেওয়ালগুলো লাথি মেরে সে চূর্ণ করে; মাঝরাত্রে কখনও ভাবে দেশালাইর কাঠির একটা ফিন্‌কি,—

জতুগৃহ ভস্মীভূত হোক। যদি কোনো মন্ত্র জানা থাকতো তার—তবে সে শঙ্খের ফুৎকারে ডাক দিত দেশকে,—সকল ব্যবস্থাকে দিত উল্‌টে। জীবনটা কী কুৎসিত, কী নোংরা-ঘুলিয়ে ওঠা, বঞ্চিতের বুভুক্ষিতের কী কদর্য চিত্তগ্লানিতে জীবনটা নিত্য কিলবিল করে। অমূল্য ঠিক বলেছে, সুখী মানুষরা কখনও বেপরোয়া হয় না! সে বলেছে, প্রত্যেক ব্যক্তিজীবন এখন বিষবাষ্পে ভরা, অপমানে আর অসন্তোষে অগ্নিমুখী। দুঃখ-দুর্দশার জন্য আগে ভাগ্যকে দায়ী করা যেতো,—হিরণ্য সেদিন নাবালক ছিল। এখন সে ভুল ধরা পড়ে গেছে! দেখা যাচ্ছে, গণিতের ফাঁকির থেকে মানুষের দুর্দশার জন্ম হচ্ছে। বাসন্তীর এই ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য দায়ী সেই অঙ্কের কারসাজি। অঙ্কটাকে নির্ভুল ক'রে তুলতে হবে সংঘর্ষের দ্বারা,—অমূল্য ঠিক বলেছে।

ঔষধপত্র এবং কিছু ফলমূল আর মাখন নিয়ে হিরণ্য যখন ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালো তখন রাত প্রায় নটা। ওপাশের ভাড়াটেদের কয়েকজন স্ত্রী-পুরুষ তাঁর ঘরের দরজার পাশে জটলা করেছে। তাদের চাপা আলাপ আলোচনা কানে যেতেই হিরণ্য একটু চমকে উঠলো। ঘরে ঢুকে হিরণ্য দেখলো তা'র রুগ্ন বড় মেয়েটা ব'সে কাঁদছে। হিরণ্য প্রশ্ন করলো, তোর মা কোথায় মুন্নু?

মুন্নু বললে, মা দুপুরবেলায় বেরিয়েছে, এখনও ফেরেনি।

বেরিয়েছে! ওই রোগা শরীরে? কোথা গেছে?

ছেলেটা বললে, আমরা কেউ জানিনে।

দেড় বছরের ছেলেটা অনেক দিন ধ'রে জ্বরে ভুগছে। মুন্নু তাকে কোলের কাছে নিয়ে শান্ত করছিল। হিরণ্য জিনিসপত্র নামিয়ে রেখে

সেইদিকে চেয়ে বললে, দুপুরবেলায় বেরিয়েছে? সে 'ত' বাইরে যায় না কখনও? কার সঙ্গে গেছে?

মুন্নু বললে, নীরেন-কাকা কে বাবা?

নীরেন-কাকা! কেন রে?

নীরেন-কাকা এসেছিল, আর একজন মেয়ে ছিল সঙ্গে তার। তাদের সঙ্গে মা গেছে!

ওঃ নীরেন! আমার এক মামাতো ভাইয়ের নাম নীরেন! হ্যাঁ মনে পড়েছে! কিন্তু—কিন্তু আমাকে ব'লে যাওয়া উচিত ছিল! তা'ছাড়া রোগা ছেলেমেয়েদের ফেলে এতক্ষণ রয়েছে কেমন ক'রে? আশ্চর্য মানুষ যা হোক—হিরণ্য এবার যেন একটু বিরক্তই হোলো।

মুন্নু বললে, তারা নিয়ে যেতে চায়নি বাবা, মা-ই গেছে জোর ক'রে। তা'রা শুধু তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তারা কত মানা করলো মাকে,—মা শুনলো না।

ছেলেটা এবার একটু সাহস পেয়ে এগিয়া এলো। বললে, বাবা, জানো ত'—যাবার আগে মা কী বমি করছিল!

বমি! বমি কি রে?

মুন্নু বললে, হ্যাঁ বাবা, সে কী বমি,—সব রক্ত। অনেক রক্ত বাবা।

রক্ত!—হিরণ্যর গা ডোল হয়ে এলো। ভগ্ন আর্তকণ্ঠে সে বললে, রক্তবমি? তা'র মানে? তোরা ঠিক দেখেছিস?

আমরা সবাই দেখেছি। ওপাশের ওরাও দেখতে এসেছিল। ওরা কত মানা করলো মাকে—মা তবু গেল।

হিরণ্য আকুলকণ্ঠে বললে, কোথা যাচ্ছে বললে না?

আলোটা টিপ্ টিপ্ করছে। ছায়াগুলো পড়েছে যেন আতঙ্কের। ওই ছায়াদলের ভিতর থেকে কে যেন বেরিয়ে তার গলা টিপে ধরতে চাইছে। রক্তবমির রহস্য তার অজানা নয়,—সে ছেলেমানুষ নয়। ওই শরীর নিয়ে সে বেপরোয়া হ'য়ে বেরিয়ে পড়বে—এও বাসন্তীর পক্ষে অস্বাভাবিক। নীরেন অবিবেচক নয়,—এতকাল পরে দেখা করতে এসে হঠাৎ রুগ্না ভ্রাতৃ-জায়াকে দুপুরের রৌদ্রে ছুটিয়ে নিয়ে যাবে, এতটা অজ্ঞানও সে নয়। স্বামী বাড়ী নেই, ছেলেমেয়েদের অসুখ, রান্নাবান্নার বিশৃঙ্খলা, নিজে রক্তবমি করেছে—এমন অবস্থায় বাসন্তীর মতো বুদ্ধিমতী মেয়ে জিদ ধ'রে ঘরদোর ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে,—এই বা কেমন ক'রে সম্ভব? কোথায় কিছু একটা কথা যেন চাপা থেকে যাচ্ছে, হিরণ্য কোনোমতেই সে-রহস্যের কাছে পৌঁছতে পারলো না। অন্যদিন এতক্ষণ সে সযত্নে আপিসের জামা-কাপড় ছেড়ে গুছিয়ে রাখতো, আজ কিন্তু সে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। দরদর ক'রে ঘাম গড়াতে লাগলো তার কপাল বেয়ে।

হঠাৎ একবার সে বাইরে এলো ছিটকিয়ে। কিন্তু কোথায় যাবে সে খুঁজতে এতরাত্রে? নীরেনের ঠিকানা তা'র জানা নেই,—কেননা নীরেন বরাবরই থাকে বিদেশে। ওদের সঙ্গে হিরণ্যর যোগসূত্র কম। সুতরাং ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে গেলে তাকে ব্যর্থ হয়েই আবার ফিরে আসতে হবে।

পাশের ভাড়াটেদের একটি ভদ্রলোক এতক্ষণ চুপ ক'রে ওধারে দাঁড়িয়ে হিরণ্যকে লক্ষ্য করছিলেন। তিনি এবার এগিয়ে এলেন। বললেন, আপনি একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন,—হওয়াই স্বাভাবিক।

শুনতে পাই আপনার স্ত্রী নাকি অসুস্থ—

হিরণ্য বললে, তিনি খুবই অসুস্থ!

সে যেন কাঁদলো। ভদ্রলোক সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তবে কিনা আপনার ভয় পাবার কিছু নেই। আমার ভগ্নী বলছিলেন, আপনার স্ত্রী সিনেমায় গেছেন।

সিনেমায়? কী বলছেন আপনি? অসম্ভব!

অসম্ভব কিছু নয়, হিরণ্যবাবু। দিনরাত ছোট্ট জায়গায় থাকেন, একটু নিঃশ্বেস ফেলতে পান না,—তাই যা হোক একটু সাধ-আহ্লাদ......মানে, সাধ-আহ্লাদও নয়,—ঘরকন্না আর রোগভোগ থেকে একদিনের জন্যে একটু মুক্তি, একটু আলো হাওয়ায় আমোদ-আনন্দে ঘুরে আসা!

কিন্তু আমার সঙ্গে তিনি ত' কখনও যেতে চাননি?

ভদ্রলোক বললেন, এটাও স্বাভাবিক, হিরণ্যবাবু। আপনার সঙ্গে দিনরাত তিনি রয়েছেন; দুঃখু-ধান্দা, অভাব-অনটন, ভাবনা-চিন্তে—সবগুলো রয়েছে আপনাকে ঘিরে। ওগুলোকে খানিকক্ষণের জন্যে ভুলতে গেলে আপনাকেও খানিকক্ষণ এড়িয়ে থাকতে হয়—এইটুকুই তাঁর ছুটি। মেয়েদের মন নিয়ে ভাবলে তবেই আমরা মেয়েদের মনের কথা বুঝতে পারি।

হিরণ্য বললে, আপনার ভগ্নী কেমন ক'রে জানলেন তিনি সিনেমায় গেছেন?

বোধ হয় জানিয়ে গেছেন তিনি।

ভিতর থেকে মুন্নু ডাকলো, বাবা,—

হিরণ্য আবার ভিতরে এসে দাঁড়ালো। মুন্নু বললে, মা সেই সিল্কের শাড়ীটা পরে গেছে, বাবা। আর সেই ব্রোকেডের জামাটা। ওই দেখনা তোরঙ্গ এখনও খোলা। আল্‌তা পরলো পায়ে, টিপ পরলো, ওদের ঘর থেকে পাউডার আনলো। মা খুব সেজে গুজে গেছে!

ছেলেটা বললে, বাবা, মা তোমার বাজার করার ছেঁড়া চটিটা পায়ে দিয়ে গেছে। মার পায়ে কী বিচ্ছিরি দেখাচ্ছিল তোমার জুতো।

থাম্ তুই।—মুন্নু তাকে ধমক দিল।

হিরণ্য এবার গায়ের জামাটা ছেড়ে একটু নিঃশ্বাস নিল। তারপর বাজার থেকে খাবার জিনিষ যেগুলো এনেছিল, তার অনেকটা অংশ ছেলে-মেয়েদের ভাগ করে দিল। কাল সকালে আবার বাসন্তীর জন্য এনে দিলেই চলবে। কাল সকাল থেকে বাসন্তীর নতুন চিকিৎসার ব্যবস্থাও তাকে করতে হবে। অনেক টাকার দরকার। আপিসের সাহেবকে সব কথা খুলে না বললে আর চলবে না। হিরণ্যর এক ভাগ্নে আছে লোহার কারবারী—তার কাছে গিয়ে কেঁদে প'ড়ে কিছু টাকা আনতে হবে। তার এক অবীরা বিধবা খুড়ী আছেন খিদিরপুরের কোন্ আশ্রমে, তাঁকে কিছু-দিনের জন্য আনতে পারলে ভালো হয়। কিন্তু তাঁর থাকবার মত জায়গা এখানে কোথায়? দুটো ছেলেমেয়েকে নিয়ে হিরণ্য যদি বাইরে গিয়ে কোথাও রাতটা কাটিয়ে আসতে পারে, তবে হয়ত এখানে খুড়িমার জায়গা হয়।

রাত তখন দশটা বেজে গেছে। পথের দিককার জানলায় মুখ বাড়িয়ে বাইরে থেকে গলার আওয়াজ এলো, ছোড়দা!

কে?

আমি নীরেন।

হিরণ্য ব্যস্ত হয়ে বললে, এসো এসো, এত দেরী তোমাদের? আমি সেই থেকে বসে ভাবছি।

তুমি একবার বাইরে এসো, ছোড়দা।

যাই।—কেন বলো ত? তোমার বৌদি কোথায়?—বলতে বলতে হিরণ্য বাইরে এলো।—কই, তোমার বৌদি আসেননি?

একটি তরুণী দাঁড়িয়ে রয়েছে নীরেনের পাশে। নীরেন বললে, কতকাল পরে দেখা তোমার সঙ্গে, ছোড়দা। কিন্তু কথা বলবার সময় নেই, তুমি জামা গায়ে দিয়ে এসো একবারটি।

হিরণ্য ছুটে গিয়ে জামা চড়িয়ে আবার বেরিয়ে এলো।—উদ্বিগ্ন হয়ে বললে, তোমার বৌদি নাকি তোমাদের সঙ্গে সিনেমায় গিয়েছিলেন? কোথায় তিনি?

নীরেন বললে, ব্যস্ত হয়ো না, আমি তাঁর ওখান থেকেই আসছি।

তিনি এলেন না কেন?

আসতে পারেননি। ব্যাপারটা যে এমন—আগে জানলে আমি তোমার এখানে আসতুম না ছোড়দা। সব অপরাধ আমাদেরই।

তার করুণ ভগ্নস্বর শুনে হিরণ্য ভয় পেয়ে বললে, কি হয়েছে?

পাশের মেয়েটিকে দেখিয়ে নীরেন বললে, এঁর নাম আভা। আমরা দু'জনে একই ইউনিভারসিটি থেকে পাস করে বেরিয়েছি। আমাদের বিয়ে আসছে মাসের দু'তারিখে। তোমাকে নেমন্তন্ন করতে এসেছিলুম।

আভা বললে, আমরা কখনই সন্দেহ করিনি আপনার স্ত্রী এত অসুস্থ। তিনি আমাদেরকে গাড়ীর মধ্যে বসিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি কাপড় বদলে বেরিয়ে এলেন। কী চীৎকার মানুষ, কী মিষ্টি মেয়ে!

শোন ছোড়দা—নীরেন বলতে লাগলো, আমাদের সত্যিই ইচ্ছে ছিল তোমার এখান থেকে বেরিয়ে সিনেমায় যাবো। বৌদি ধরে বসলেন, তাঁকে নিয়ে যেতে হবে। হঠাৎ এত পীড়াপীড়ি—যাঁকে জীবনে একবার মাত্র দেখেছি—তাঁর কাছে আশা করিনি। আমরা চক্ষুলজ্জায় পড়েই রাজি হলুম।

আভা বললে, রাজি হওয়াই উচিত,—তিনি গুরুজন, একটা সামান্য অনুরোধ তাঁর,—আমরা ত আনন্দই পেলুম। দু'জনেই ঠিক করলুম, আপনার আপিস থেকে ফেরার আগেই আমরা এসে পড়বো।

নীরেন বললে, বৌদিদি প্রথমে একটু গম্ভীর হয়েই আমাদের গাড়ীতে এসে উঠলেন। ইচ্ছে নেই, অথচ যেন বেপরোয়া। গাড়ীতে বসে খানিকক্ষণ আভার সঙ্গে কেমন যেন এলোমেলো গল্প করতে লাগলেন। একবার হাসতে গিয়ে কাঁদলেন। আভাকে একটু আদর করতে গিয়ে ওর হাতে নখ বসিয়ে দিলেন। আভা ত' আড়ষ্ট। যাই হোক সিনেমার টিকিট করে ভিতরে গিয়ে বসলুম। কিন্তু ছবি শেষ হবার আগে হঠাৎ চক্ষু রক্তবর্ণ করে তিনি ধমক দিয়ে বললেন, কেন আনলে তোমরা আমাকে ?

তারপর ?—হিরণ্য প্রশ্ন করলো।

আভা বললে, তাঁর চেঁচামেচিতে ভয় পেয়ে তাঁকে নিয়ে আমরা উঠে এলুম। বাইরে এসে তিনি হেসে একেবারে লুটোপুটি। বললেন, আমাকে মাঠে নিয়ে চলো।

নীরেন বললে, না, তার আগে বললেন, আমাকে আগে ওই ছোট ছেলেদের বেলুন কিনে দিতে হবে,—ওই যেটা হাওয়ায় উড়ে যায়।

হিরণ্য বললে, মাঠে গেলে তোমরা ?

ছোড়দা, কি বলবো তোমাকে! আমাদের যাবার আগেই তিনি রাস্তা পেরিয়ে ছুটলেন। আর একটু—একটুখানির জন্যে, নৈলে তিনি মোটর চাপা পড়তেন। তারপর ছুটলেন তিনি মাঠের দিকে। হোঁচট খেলেন দুবার, তবু ছুটলেন। যখন আমরা তাঁকে গিয়ে ধরলুম, তিনি তখন হাঁপাচ্ছেন, মুখখানা রক্তহীন। চেয়ে দেখি পায়ে তাঁর একপাটি চটিজুতো,—আর একপাটি কোথায় তাঁর মনে নেই।

আর্তকণ্ঠে হিরণ্য বললে, তাঁকে কোথায় রেখে এলে তোমরা ?

নীরেন হিরণ্যকে গলির মোড়ে নিয়ে এলো। সেখানে একখানা মোটর অপেক্ষা করছিল। আভা বললে, আপনি গাড়ীতে উঠুন।

তিনজনেই গাড়ীতে উঠে বসলো।

নীরেন বলতে লাগলো, আমাদের তখন একমাত্র চেষ্টা কোনোমতে তাঁকে ভুলিয়ে তোমার ওখানে পৌঁছিয়ে দেওয়া। কিন্তু বৌদি ফিরতে রাজি হলেন না। তিনি ছুটতে চান, তাঁকে ধরে রাখা যায় না।

আভা বললে, একসময়ে চেঁচিয়ে গান ধরলেন। তারপর দেখি নিজের হাতে সিল্কের শাড়ীখানা ছিঁড়ছেন। আমি গিয়ে তাঁকে চেপে ধরলুম।

হিরণ্যর গলার কাছে যেন একটা কুণ্ডলী উঠে এলো। সেটা হ'তে পারে কান্না, হতে পারে তালপাকানো হৃৎপিণ্ডের রক্ত !

নীরেন বললে, তারপর ছোড়দা, মাঠের ঘাসের ওপর প'ড়ে বৌদির কী গড়াগড়ি,—আমরা তাঁকে ধরে রাখতে আর পারিনে। আমি রাগ করলুম এক সময়ে,—কেননা আশেপাশে লোক দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমার ধমক শুনে তাঁর কী হাসি !

আভা বললে, তখন আমরা দেখলুম তাঁর মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে এসেছে ! আমি তাঁকে ধ'রে রইলুম, উনি মোটর ডেকে আনলেন।

কী চিৎকার গাড়ীর মধ্যে ! কী সাংঘাতিক আক্রোশ তাঁর মুখে চোখে। কিছুতেই বাড়ী ফিরবেন না !

কোনোমতে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে তুললুম আমরা। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে শান্ত হয়ে বললেন, আঃ !

মোটরখানা সোজা হাসপাতালের ভিতরে এসে ঢুকলো। বেড নম্বর তেরো। রোগীর খবর কি ?—দাঁড়ান্ দেখে আসি।

হিরণ্যর পাশে আভা ও নীরেন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। একটু পরে নার্স ফিরে এসে বললে, এখন দেখা হবে না।

কেমন আছেন রোগিণী?

বলবার নিয়ম নেই। আপনারা কে?

উনি আমার স্ত্রী—। হিরণ্য এগিয়ে এলো।

নার্স মুখের দিকে চেয়ে বললে, অক্সিজেন্ দেওয়া হচ্ছে!

হিরণ্যর সহসা মনে হোলো, সে উন্মাদের মতো প্রশ্ন করে, অক্সিজেন্ কেন? এই বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির জল স্থল শূন্যে এতটুকু হাওয়াও কি বাসন্তীর প্রাণধারণের জন্ত অবশিষ্ট নেই? দরিদ্রের ভগবান কি শেষ নিঃশ্বাসটুকুও শুষে নিতে চান্?

কিন্তু, না থাক্—হিরণ্য, কই, ঈশ্বরবিশ্বাসী ত' নয়! আজ হঠাৎ নিরুপায়ের মতো কেন এই আকুলি বিকুলি? অপরাধ মানুষের, সমস্ত ব্যবস্থাপনার—যারা বায়ুকে বিষাক্ত করেছে সব দিক থেকে, যারা আজ বাসন্তীকে নিঃশ্বাস নিতে দিচ্ছে না! ভগবানের দোষ কি?

একটু আগে জানতে পারলে ভালো হোতো। অমূল্যর কাছে টাকা নিয়ে হিরণ্য এনেছিল দুধের গুঁড়ো, টিনের মাখন, বাক্সখোলা পুরনো ফল, তেলকাগজ মোড়া খেজুর। সেগুলো এনে রাখতে পারতো বাসন্তীর শিয়রে। আর ছিল তোরঙ্গর তলায় বিয়ের সময়কার ঢাকাই শাঁখার জোড়াটা। বাসন্তীর ইচ্ছা ছিল, সোনা দিয়ে শাঁখা জোড়াটা একদিন না একদিন বাঁধাবে। আনলেই হোতো সে দুগাছা। কিন্তু—ছয়টি ছেলে-মেয়ের কথা হিরণ্যর ভাবতে ভয় করে!

ভোরবেলা চোখের জল ফেলে আভা আর নীরেন বিদায় নিল। যাবার সময় বললে, ছোড়দা, একা তুমি পারবে না। আমরা আবার আসছি, আমরাও শ্মশানে যাবো।

রোগা মুখের উপর বড় বড় দুটো চোখ, কপালে তার চেয়েও বড় সিঁদুরের ফোঁটা, পায়ে আলতা মাখানো,—হিরণ্য চুপ করে চেয়ে থাকে। হোঁচট খাবার ক্ষতচিহ্ন রয়েছে পায়ের মাঝের আঙুলে!

ছোটবেলাকার দেখা একটি দৃশ্য হিরণ্যর মনে পড়ে যায়। ছ্যাকড়া গাড়ীর শান্ত নিরীহ ঘোড়া, দেহখানা দুর্বল কঙ্কালের একটি খাঁচা। চাবুক খেয়ে আঘাত বোধ করে না, ছোটে না, প্রতিবাদও জানায় না। সহসা একদিন সেই ঘোড়া তোড়জোড় ভেঙ্গে শিকল ছিঁড়ে অন্ধগতিতে ছোটে —কোন্ দিকে ছোটে সে জানে না। কিন্তু চোখে তার বিপ্লবের ধক্‌ধকে আগুন। অবশেষে সাংঘাতিক পরিণামের মধ্যে পড়ে সেই ঘোড়া থামে। মৃত্যুর ছায়াতে সেই অগ্নিদৃষ্টি ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসে। বোধ হয় যেন সে শান্তি খুঁজে পায়।

সাড়ে তিন হাত

একখানা পা একটু খোঁড়া, একটু বাঁকা। চলতে গেলে একপাশে একটু নুইয়ে পড়ে, আবার কথা বলতে গেলে ওরই মধ্যে একটু বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে।

বললে, কিন্তু এই খোঁড়া পায়েরই দাম দিয়েছে বড় সাহেব, বুঝলে বুড়িমা?

বুড়ি বললে, খোঁড়া পা বুঝি তোমার? দেখতে পাইনে চোখে!

রাখু মিস্ত্রি উৎসাহিত হয়ে বললে, ষাট টাকা মাইনে, ছাব্বিশ টাকা মাগ্‌গি ভাতা,—দরখাস্তখানা প'ড়ে সাহেব আর টুঁ শব্দটি করলে না, খচাখচ হাতের সই মেরে দিল।

বুড়ি বললে, এত টাকা পাবে, কি কাজ করবে গা?

কাজ!—রাখু হো হো ক'রে হেসে উঠলো। তারপর বিড়ি আর দেশালাই বার ক'রে ধীরে সুস্থে ধরিয়ে আবার হেসে উঠে তাকালো বুড়ির দিকে। বললে, কাজ কি আর বোঝাবো, তোমরা হ'লে সেকেলে লোক!—উ-ই ত্যাখো, দেখতে পাচ্ছ? বলি পাচ্ছ কিছু দেখতে? ওই ওদিকে ন' নম্বর তাঁবু পড়েছে সরকারী সড়কে।

বুড়ির ঘাড় কাঁপে কিন্তু স্বল্পদৃষ্টি চোখ দুটো একদিকে ফিরিয়ে বললে, কই না—

রাখু বললে, এক এক দলে পাঁচশো কুলি কামিন্‌—আমি ওদের কর্তা। ...উঠবে বসবে আমার হুকুমে,—এবার বুঝলে?

বুড়ি বললে, তোমার হুকুমে? তুমি কোম্পানীর কে?

কোম্পানী ?—রাখু এবার যেন একটু সবিস্ময়ে তাকায়।

কোম্পানী গো, কোম্পানী ! এটা কোম্পানীর রাজত্ব না ?

বিড়িটা এবার একবার টেনে রাখু বললে, তোমার বয়স কত হোলো গা বুড়িমা ?

কেন বলো দিকি ?

জিজ্ঞেস করছি গো ?

ও, তা ধরো বাছা, আমার নাৎনীর ছেলেটা বেঁচে থাকলে তার দেড় কুড়ি বয়স হতো। আর এখন নাৎনীও নেই ! বুড়ো নাৎজামাইটে ম'রে গেল। নাৎনী গেল গয়া করতে, আর কই ফিরলো না !—বুড়ির গলা নরম হয়ে এলো।

রাখু আন্দাজে বুঝলো, বুড়ির বয়স প্রায় নব্বইয়ের কাছাকাছি, প্রায় এক শতাব্দি। এক সময়ে বললে, শোন বুড়িমা, এখন আর কোম্পানীর রাজত্বও নেই, ইংরেজ রাজত্বও নেই,—এখন হোলো সব স্বদেশী, বুঝলে ?

বুড়ির মুখের কোনো রেখা পরিবর্তন হোলো না। শুধু বললে, ও।

এবার কিন্তু তোমাদের পাততাড়ি গুটোতে হবে, বুড়িমা। আর এখানে নয়,—এসব এখন সরকারি দখলে গেছে।

কেন গা ?

শোনোনি ? বসতি-বেসাতি ভেঙ্গে এবার স্রেফ মাঠ-ময়দান ! তোমাদের এখান দিয়ে ষাট ফুট চওড়া রাস্তা।

রাস্তা ? কেন গো ?

রাখু মিস্ত্রি এবার অসীম তৃপ্তির হাসি হাসলো। বললে, চোখে দেখতে পাওনা, তাই। পেলে দেখতে, আমার পরণে গোরাদের হাফ-

প্যাণ্ট্, বুশ-শার্ট,—ভিখু মোড়লের ছেলেকে চিনতে পারবে কেউ? এখন বাবা স্বাধীন দেশ, ওসব চালাকি আর চলবে না।

বুড়ি বললে, চেয়ে দেখো ত' বাবা—ওদিকে গোবর পড়েছে কিনা।

না পড়েনি, গোবর আর পড়বেও না, বুড়িমা। এ সব গাঁ-ঘর কি আর থাকবে?

পাকা পাকা বাড়ী, সায়েবদের বাংলা, কলকারখানা—

কোথা যাবে সব?

ভোজবাজির মতন উড়ে যাবে, আর যাবে কোথা? বটপুকুরের ওদিকে ছিল বোরেগীদের আখড়া,—তা'রা গেল কোথায় বলো না, শুনি? হাটতলা ফর্সা,—সেই তামাকের দোকান, সেই যে শরকাঠি দিয়ে পলো বুনতো জেলেরা, গোলদারি আড়ৎ,—কিচ্ছু নেই! আটঘরার ওই যে অত বড় বস্তি,—একখানা পুরণো বাঁকারিও খুঁজে পাবে না! এখন শহর বসবে চারিদিকে,—বড় বড় গদি মাড়োয়ারি ভাটিয়ার—

রাখু মিস্ত্রির মনে যেমন আনন্দ, চোখে তেমনই কৌতুক। বুড়ি তার দিকে একবার ঠাহর করবার চেষ্টা করলো। বললে, হ্যাঁ, বটে, দেখতে পাইনে চোখে। কানাকান্তর জলপড়া দিয়েছিলুম চোখ দু'টোয়,—কই, সারলো না।—হ্যাঁ গা, তোমাকে এখনও বাছা আমি চিনতে পারি নি। ভিখু মোড়ল কোথাকার?

দাঁড়াও, চিনবে। ভালো ক'রেই চিনবে।—রাখু এবার একটা টিবির ওপর গুছিয়ে বসলো। পুনরায় ব'লে, বাবুইহাটির সেই ধানকল মনে পড়ে?

হ্যাঁ—

আমি সেই কলে কাজ করতুম। সেখানকার মেসিনেই ত' একখানা পা আটকে গিয়ে এই দশা। দু'খানা পা সমান থাকলে কি আর ভাবনা

ছিল? বড় সাহেবের খাসদপ্তরে কাজ পেয়ে যেতুম! তোমার এই টিবিতে তখন আর বসতুম না, বুঝলে? গদি আঁটা চেয়ার!

বুড়ি বললে, তবু চিনতে পারলুম না গো!

আচ্ছা, দাঁড়াও। মন্‌সার সেই ঠান্‌দিকে মনে আছে?

মন্‌সা কে?

মন্‌সা গো, রাখাল বোরেগীর পিসি—

কোন্ রাখালের কথা বলছ?

তোমার নাৎনীর জোত নিয়ে মামলা যার সঙ্গে—

হ্যাঁ হ্যাঁ—সেই লেটেল—

তার পিসি মন্‌সা—

আমাদের মানদা?

ঠিক ধরেছ। আমি হলুম সেই মানদার ভাশুর পো।

বুড়ি বললে, মেয়েটা বদরাগী ছিল, তাই বলতো মন্‌সা! অনেক কাল ম'রে গেছে।

রাখু বললে, তোমার বয়সী আর কেউ বেঁচে নেই। ময়না বুড়ি, ঠান্‌দির মা, ময়রানি, কালোখুড়ি, দাস্থদিদিমা—সবাই গেছে।

বুড়ি বললে, খেয়ে দেয়ে সব গেছে, হাত পাততে হয় নি। তাই ত' বাছা, এবার চিনলুম তোমাকে, তুমি ঘরের লোক।

উহুঁ, না,—রাখু বললে, ওটি হবে না বুড়িমা। ঘরের লোক বলে ঘুষ খেতে আমি পারবো না। আমি এখন সরকারি চাকুরে। ইংরেজ আমলে ঘুষ চলতো, এখন আর ওসব নেই। আমি কিছু করতে পারবো না, তোমাকে উঠতেই হবে এখান থেকে।

উঠতেই হবে? কোথায় গো?

এসব বস্‌তি-টস্‌তি কিচ্ছু রাখতে পারবো না। সাহেব-সুবোরা এসে সব মেপে নিয়ে গেছে।* গাঁ কে গাঁ উড়ে যাবে।

বুড়ি এবার কিয়ৎক্ষণ থমকে রইলো। তারপর বললে, গাঁয়ের মধ্যে শহর-বাজার বসবে কেন গা?

রাখু হেসে বললে, একেই বলে মেয়েমানুষ! কিচ্ছু খবর রাখে না। বলি, নদী যে বাঁধবে, শোনোনি? দামোদর গো, দামোদর! জল চালা-চালি হবে এধার ওধার।

নদী বাঁধবে? ভগমানের নদী বাঁধবে কি গো?

ওই ত' বলে কে? 'নদী বাঁধবে, দেশে আকাল থাকবে না। ধান-চালে সব ভ'রে যাবে, সব দুঃখ ঘুচবে! কত লোকের চাকরি, কাজ-কারবার, কত মোটরগাড়ী, দোকানদানি—এসব খোঁয়াড়ে-বস্তি মন্তরের চোটে সব সাফ হয়ে যাবে। সেই জন্যেই ত বলছি, কথাটা কান পেতে শোনো,—সময় থাকতে একটু জায়গা খুঁজে নাও।

শুনতে শুনতে বুড়ির ঘাড় কাঁপছিল। এই জীবনেই তা'র অনেক ইতিহাস জমা হয়েছে, কিন্তু এটা নতুন, এটা শুনলে বুক যেন দুরু দুরু করে। রাখু যা বলছে সেটা অভাবনীয়, কেন না সেটা বুড়ির বুদ্ধির অগম্য, কল্পনার অগোচর। চৈত্রের ঝড়ে ঘরের চাল উড়ে যায়, ভাদ্রের বন্যায় গ্রাম ভাসে, মড়কে সব ঝেঁটিয়ে নিয়ে যায়, আকালে গরু-বাছুর মরে, বাঘে ছাগল নিয়ে পালায়—এ গুলো হলো চলতি জীবনের মধ্যে অভিনবত্ব, এগুলো ভেবে নেওয়া যায়। কিন্তু নদী বাঁধা পড়বে—সে কেমন? গ্রাম অদৃশ্য হবে, প্রান্তরের উপর শহর বসবে, চওড়া পাকা রাস্তা,—এ সব হোলো বুড়ির কাছে রূপকথা। বছর চব্বিশেক আগে শিবরাত্রির কোন্ এক মেলা থেকে ফিরবার পথে বুড়ি একবার গিয়েছিল বর্ধমান শহরে। সে

এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। বুড়ি জলের কল দেখে অবাক। দেখে এলো একতলার উপর দোতলা বাড়ী, দেখে এলো ঘোড়ার গাড়ী। ভয় হয়েছিল গাড়ীখানা ছুটে এসে না তাকে চাপাই দেয়। বর্ধমানের কথা মনে ক'রে কত রাত্রি যে বুড়ির সুনিদ্রা হয় নি, সে কথা বুড়ি নিজেই জানে।

আচ্ছা, বুড়িমা—রাখু একবার ডাকলো।

বুড়ি বললে, কেন বাছা?

তোমার এ ঘরখানা ক'দ্দিনের বলো দিকি?

আ কপাল!—বুড়ি বললে, ওটা নাড়ু ঘরামির গোয়াল ছিল, এ পাশে আমাকে একটু ঠাঁই দেছে। চালে ছন্ নেই বাছা। শীতে কুঁকড়ে থাকি; ছেঁড়া কাঁথাখানা কুকুরে নিয়ে গেছে। এবারে বৃষ্টিটা গেল গায়ের ওপর দিয়ে,—সারারাত ব'সে ব'সে ঢুলি বাছা।

রান্না কোথায় হয় তোমার, বুড়িমা?

রান্না আর কি বলো। যুগীদের খামারের এক কোনে খুদসেদ্ধর হাঁড়ি আছে, ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে দেয় অমন দু'খোস্তা। মেগে পেতে খাই, বাবা।

কিন্তু আরো ত খরচা আছে!

এক বেলা এক মুঠো পেলেই হোলো,—ও ছাড়া আর খরচা কি, গো?—গোবর পেলে ঘুঁটে দিই। তাও থাকে না, শুকোলেই কে যেন খুলে নিয়ে যায়। আর বাছা, গাঁয়ে আর ভিক্ষেও জোটে না।

রাখু আর একটা বিড়ি ইতিমধ্যে ধরিয়েছিল, কিন্তু সেটাও কখন যেন নিবে গেছে। নিবে যাওয়ার কারণ ছিল। যার কাছে এসে রাখু তা'র নবলব্ধ চাকরির জন্য বাহাদুরি নেবার চেষ্টা করছিল তা'র জীবন-যাত্রার চেহারা দেখে এতক্ষণে তা'র উৎসাহ কিছু কমেছে।

রাখু বললে, আচ্ছা, বুড়িমা, তোমার এখানে যে বাছুরটা বাঁধা থাকতো সেটা গেল কোথা ?

বুড়ির ক্ষীণ দৃষ্টি এবার যেন একটু বড় বড় হয়ে এলো। খোসাওঠা শীর্ণ মুখখানা তুলে সে বললে, হাবলির কথা বলছ ? সে ত'আর নেই !

বুড়ির চোখ দুটো জ্বালা ক'রে এবার জল এসে পড়লো।

রাখু বললে, ম'রে গেছে বুঝি ?

না, বাছা,—নিয়ে গেছে কে যেন ! ওই হোথা কোন্ দিক থেকে জন খাটতে আসে, তারাই নাকি আমার হাবলিকে নিয়ে গেছে !

বাৎসল্য স্নেহে বুড়ির গলা ধ'রে এলো। গরুটি ছিল তা'র একমাত্র সম্বল !

রাখু বললে, জন খাটতে আসে ? কা'দের কথা বলছ ? আমার লোক ছাড়া আর কে আসে এ তল্লাটে ? আচ্ছা দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা,—তুমি কেঁদোনা বুড়িমা,—যদি থাকে সে-গরু বেঁচে, ঠিক তুমি ফেরৎ পাবে !

রাখুর বেলা হয়ে গিয়েছিল, এবার সে উঠবার চেষ্টা করলো।

বুড়ি কেঁদে কেঁদে বললে, একমাস বয়সে ওর মা ম'রে গেল, আমি বুকে ক'রে মানুষ করলুম। এতখানি শরীর হোলো, এই পালান। এমন গরু এ গাঁয়ে কোথাও নেই। গেল বছর বিউলো,—তিন সের ক'রে দুধ। বাবা, আমার দিনটা চলে যেতো। হাবলি থাকতে ভিক্ষে করিনি, নিজের মান বাঁচিয়ে গতর খাটিয়ে খেয়েছি। মনে করলাম, মরণকালে আর মান খুইয়ে যেতে হবে না !

তা ত' বটেই বুড়িমা ! মনে কি নেই, বড় ঘরের মেয়ে তুমি ! শশী বোরেগীর ঘর, অমন কীর্ত্তনে বর্ধমান জেলায় নেই। আচ্ছা, আমি দেখছি,—কদ্দিন হোলো বলো, দিকি ?

তা হোলো বাছা প্রায় ছ'মাস !

ছ' মাস !

রাখু গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বললে, আমি খোঁজ রাখবো, কথা দিচ্ছি তোমাকে বুড়িমা,—কিন্তু একটা কথা—

বুড়ি বললে, কি গো ?

কাছে এসে রাখু বললে, আটঘরার বসতি ভেঙ্গেছে, এবার এদিকটা ধরবে। আমি বলি কি, তুমি নদীর ওপারে কোথাও একটু ঠাঁই দেখে নাওগে। এখানে আর থাকতে দেবে না।

তোমরা যাবে কোথায় ?

আমরা ?—রাখু হাসলো, তারপর অভ্যাস মতো বুকটা একটু ফুলিয়ে বললে, ব্যারাক বাড়ীগুলো কাদের জন্যে উঠবে ? —যাক সে কথা। আমি দেখি যদি গরুটা কোথাও খুঁজে পাই।

রাখু খুঁড়িয়ে চলে, কিন্তু দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি তার চলাটা লক্ষ্য করতে থাকলে সে যথাসম্ভব সোজা হয়ে হাঁটবার চেষ্টা করে। এবারেও তার ব্যতিক্রম হলো না।

ময়নাবুড়িরা ছিল ওর সমসাময়িক। কাঠা তিনেক খাজনা করা জমী ছিল তা'র। তারই মধ্যে ছিল গোটা তিন চার নারকেল গাছ। ময়নাবুড়ি ওতেই কোনো মতে চালিয়ে নিত। দামুদিদি ধানকলে কাজ ক'রে আসতো, তারও চলতো। ঠানদির মা, কালোখুড়ি, ময়রানি,—কেউই ভিক্ষে করেনি। বাউরিদের ঘরে কাঠ তুলতে গিয়ে ময়রানিকে সাপে কামড়ালো,—কত তুক-তাক, ঝাঁড় ফুঁক, কিন্তু ময়রানি সেই যে নীলবর্ণ

হয়ে শু'লো, আর উঠলো না। তা হোক কা'রো ঘাড়ে বোঝা হয়ে না থেকে একরকম ভালোই হয়েছে। কালোখুড়ির গতর ছিল, গলার আওয়াজ ছিল তার চেয়েও বেশী,—সে ভুবন তা-র বাড়ী ঢেঁকি কুটতো, মুড়ি ভেজে দিত। চেহারাটা আঁটসাঁট ছিল, তাই একটা মনিষ্যি থাকতো তা'র ঘরে। লোকটা নাকি কোন্ ইষ্টিশানে কাজ করতো। সেই কালোখুড়িই একদিন বলেছিল, আদুর মা, সময়মতন কিছু কল্লিনে, বাসিমড়ার মুখে আগুন দেবার কেউ থাকবে না দেখিস।

আদুর মা'র ঘাড় কাঁপে, কিন্তু আজও কালোখুড়ির কথার কোনো কুলকিনারা পায় না। 'আজ শুধু শূন্য, কিন্তু সেদিন শূন্য ছিল না। ওই বটপুকুরের উত্তর দিকে ছিল বারোয়ারিতলা, তা'র এধারে ছিল সেই গুপী মোহান্তর ঘর, কত গাওনা-বাদ্যি, জলজলাট। মাঝরাত্তির পর্যন্ত ঢেঁকির শব্দ গাঁয়ে, গাজনতলার আখড়ায় দিন রাত হৈ চৈ। কোনো এক ঘরে ঢুকে কচুপাতা কেটে নিয়ে ব'সে গেলেই হোলো। দই, চিড়ে আর নাড়ু, আর নয় ত' ফ্যানভাতের সঙ্গে বেগুনসিদ্ধ, এক খাবলা তেল-নুন। দিন ত' এমনি ক'রেই গেছে, এমনি ক'রেই চ'লে যেতো! গোবিন্দপালের বুকের ছাতি ছিল চওড়া। মামলায় হেরে গিয়ে গাঁ ছাড়তে বাধ্য হোলো, কিন্তু যাবার সময় বললে, আদুর মা, তোর ঘরখানা বেঁধে দিয়ে তবে গাঁ ছাড়বো! যেমন কথা তেমন কাজ।

আদুর মা-বুড়ির চোখে জল এলো। চোখ মুছলো নিজের মনে।

দিন তিনেক পরে আবার একজন পেয়াদা এসে বুড়ির ঘরের সামনে দাঁড়ালো। আদুর মা সাড়া দিল,—কে-গা বাছা, কার পায়ের শব্দ?

পেয়াদা জবাব দিল, বুড়ি, মোড়ল কুছ বলিয়েছে তোমাকে?

তুমি কে গা?

হামি সর্দার। তুম্‌হাকে নুটিশ লাগাতে আসিয়েছি।

আহুর মা ঠুক্‌ ঠুক্‌ করতে করতে বেরিয়ে এলো। পেয়াদা ঘরের ভিতরটায় একবার তাকিয়ে বললে, গরু-হারাম থাকে না এ ঘরকে, তুমি থাকো কেমন ক'রে? কে খাওয়ায়, তুম্‌হাকে?

ভগমান খাওয়ায় বাবা!

ভাগোয়ান! হা হা হা—পেয়াদা একেবারে হেসে লুটোপুটি। তারপরে বললে, বেশ ত' তোমার ভাগোয়ান সব মুলুকে বিরাজ করে ত? তুমি যেখানে যাবে সেখানেও তুম্‌হাকে খাওয়াইবে?

আহুর মা ঘাড় কাঁপিয়ে বললে, কোথায় যাবো বাবা?

কোথা যাবে সে সরকার জানে, আর জানে তুম্‌হার ভাগোয়ান, হামি কুচ্ছু জানে না। লেকিন তুম্‌হাকে যেতে হোবে!

ভাঙ্গা ভাঙ্গা রাষ্ট্রভাষা হলেও বুড়ির বুঝতে বিশেষ অসুবিধে হোল না। এখানকার উন্নতি হবে অনেক, দামোদরের জল প্রবাহিত হবে অনুর্বর প্রান্তরে প্রান্তরে, শস্যপূর্ণ হবে দেশ, অভাব থাকবে না কোথাও,—সবই সত্য, কিন্তু তা'র জায়গা এখানে নেই। তার ওপর বিধাতার এই বিধান ছিল, শ্মশানে প্রহরা দেবে সে। তা'র জন্য ছিল তৃষাদীর্ণ মাঠ, জলহীন, ফলহীন,—আসন্ন নূতনের সর্বব্যাপী পরিপূর্ণতা তার জন্য নয়,—এ কথা রাখুও জানিয়ে গেছে, আজ পেয়াদাও সেই কথা বলতে এসেছে।

বুড়ি ভয়ে ভয়ে বললে, তোমাকে কি রাখু পাঠিয়েছে, বাবা?

রাখু—পেয়াদা গরম হয়ে বললে, রাখু মোড়ল? সেই চোর বেটা? সে হারামী ঘুষ খাচ্ছে সব জাগা থেকে,—এখানে পারে নি, তাই হামার ওপর রাগ। হামি ওকে দেখিয়ে লেবো, ওর নোকরি ছুটাবো।

স্থানীয় রাজনীতি বুড়ির পক্ষে উপলব্ধি করা কঠিন। কেবল বললে, সাত-পুরুষের গাঁ ছেড়ে কোথায় যাবো বাবা?

পেয়াদা সান্ত্বনা দিয়ে বললে, বেশ ত' ঘরটা নিজের সঙ্গে খুলিয়ে লিয়ে যাও? লেকিন্—

লোকটা এগিয়ে এসে ঘরের ভিতরটায় উঁকি মেরে বললে, ওঃ কুছু নাই ঘরকে। চাল ভাঙ্গা, ছিন্ন বেড়া আছে। দু' টাকা দাম নয় এ ঘরের। একঠো মাচিস্ জ্বালিয়ে দিয়ে তুম্হি সরে পড়ো। শোন বুঢি, তিন দিন আর সোমায় দিয়া যাচ্ছে, তুম্হি জাগা ছুড়ে লাও, বুঝছ?

আদুর মার ঘাড় কাঁপছে ঘড়ির দোলকের মতো। পেয়াদার হুকুমের কোনো জবাব সে দিতে পারলো না।

পেয়াদা যাবার সময় বলে গেল, হাঁ এই চুক্তি রইলো। দেশের ভালাই কাজে সব তেয়াগ করতে হয়,—বুঢি!

ছোট্ট লাঠিটি ধ'রে গিয়ে বুড়ি সকাল বেলায় কোথা থেকে ভাঙ্গা মাটির সরায় ক'রে আমানি ভাত এনেছিল। এতক্ষণ পরে তার কথা মনে পড়লো। ঘরে তার বিশেষ কিছু নেই বটে। একখানা ছেঁড়া দোলাই আছে শীতের জন্য, আর আছে কলাইয়ের একটি চটাওঠা বাটি, আর আছে বুঝি একটা কেরোসিনের কুপি। এক টুকরো মরচে ধরা করোগেটের টুকরো--হাত দুই লম্বা--সেই দিয়ে গিয়েছিল গোবিন্দ পাল,—সেইটুকু আড়াল দিয়েই ঘরের আব্রু রাখা হয়। এক কোণে মাটির উনুন পাতা, কিন্তু ব্যবহার আর হয় না ব'লে সেখানে এখন ইঁদুরের বাসা।

অন্যান্য আসবাবের মধ্যে ফালিবাঁধা একটি সরষের তেলের ভাঁড়, তাতেও ময়লা জমেছে। চালের আধখানায় খড় নেই,—রোদ-বৃষ্টি সমানেই ভেতরে আসে।

কিন্তু আসল কথা এটা নয়। এ গ্রাম তা'র। ওদিকে সেই নিশ্চিহ্ন বারোয়ারিতলা আর গাজনতলা, বট-পুকুরের ধার, পালেদের হাটের জায়গাটা, ওই মাঠ আর নদীপথ—সবই যে তা'র।—চোখ দু'টোয় যেদিন তা'র সম্পূর্ণ ছানি পড়ে নি, তখন সে দুই চোখ ভরে দেখে রেখেছে গাজন-তলার পাশ দিয়ে বাঁশবাগানের ধার দিয়ে যাওয়া যেত মাঠের দিকে—সে মাঠও যে তা'র! নাই বা রইলো এ গাঁয়ে তা'র সাড়ে তিন হাত জমি,—কিন্তু তবু যে সাতপুরুষের অচ্ছেদ্য শিকড়! কেউ নেই আর গ্রামে সে জানে, আটঘরার বসতির শেষ চিহ্নও কিছুদিন আগে মুছে গেছে—তাও বলে গেল রাখু। আছে শুধু ঝোপঝাড়, শ্যাওলা-পড়া ডোবা, মোহান্তদের ভিটের স্তূপ, বটপুকুরের ঝুরিনামা পঞ্চবটি,—বাকিটা শুধু শ্মশান। আদুর মাকে ভিক্ষেয় বেরোতে হয় অন্ততঃ তিন ক্রোশ রাস্তা। সেই সাঁওতা পেরিয়ে বুড়োশিবতলা ছাড়িয়ে তবে গিয়ে সেই মুন্সিপাড়া। এখন নাকি চাল নেই কোনো ঘরে, লোকে খেতে পায় না। পরণে কাপড় নেই, কানি দেবে কোত্থেকে? তাই কোনো কোনো দিন আমানি খেয়েই তাকে ফিরে আসতে হয়। চোখে দেখতে পায় না ভালো, কিন্তু পা দু'টো তা'র ঠিক পথটি চেনে। লাঠিটা মাটিতে ছুঁলেই পথের সমস্ত পরিচয়টাই সে যেন পেয়ে যায়। কোন্ গাছের পর কোন্ গাছ, কোন্ বাগানের পর কোন্টা,—বুড়ি তাদের ছায়ায় আর গন্ধে বুঝতে পারে। কতবার খবর এসেছে তার কাছে,—দামোদরের ওপারে ক্রোশ দুই গেলে দাসু কামারদের মস্ত গাঁ। সেখানে

কামারদের নতুন হাটখোলা তৈরী হয়েছে। এপার থেকে মনিরুদ্দির লোকেরা সেখানে গিয়ে নাকি প্রকাণ্ড হাঁস-মুরগীর কারবার জমিয়েছে। দাস্থ কামারদের সেখানে মস্ত ঠাকুর-বাড়ী,—অনেক লোক সেখানে খায়। এই সব লোভ আদুর মা সম্বরণ করেছে।—সেখানে গেলে আর কোথাও না হোক, ঠাকুরতলার কোথাও তা'র একটু রাত্রির বাসা অবশ্যই জুটতো। কিন্তু কেন সে যাবে এ গাঁ ছেড়ে? নতুন জায়গায় গেলে ভিন্‌দেশীয়দের মান থাকে কি? ঠান্‌দির মা বলতো, মান খোয়ালে মেয়েমানুষের আর রইলো কি? বাপদাদার মাটিতে মরতে পারলে তবেই তো খাঁটি সোনা!—বলা বাহুল্য, আদুব মার যারা সমসাময়িক তারা সবাই আত্মসম্ভ্রম বজায় রেখেই বিদায় নিয়েছে।

প্রায় বছর তিরিশ হ'তে চললো, ওই দামোদরের বাঁধ একবার ভেঙ্গে ছিল। সে কী জলপ্লাবন! বানে ভেসে গেল সব, গরু-বাছুর কোথাও কিছু রইলো না। কিন্তু ঘাসের ঘুন্টি যেমন অনেক সময় প্রবল স্রোতেও নিজে মূল আঁকড়ে থাকে, আদুর মা তেমনি ছিল এই গাঁয়ে,—কোথাও এক পা নড়ে নি। কিন্তু আজকে মনে হচ্ছে, তা'র চেয়েও বড় বন্যা এসেছে,—এ বন্যা হোলো মানুষের। মানুষ ঢেউ তুলেছে, আর রক্ষে নেই। এ বানে সবাই ভাসবে,—আদুর মাও। আদুর মার দাম নেই, দাম হোলো ফসলের। ধান-চালে সব ভরে যাবে, পৃথিবী হবে পরিপূর্ণ,—সেই ভালো। তা'র এই ঘরখানার মাটিতে উঠবে বড় বড় ধানের শীষ,—সোনার বরণ,—রোদ্দুরে ঝলমল করবে। আর কোনোকালে কাউকে ভিক্ষে ক'রে খেতে হবে না! সুতরাং রাখু মোড়লের কথাই সত্যি। এ মাটি তাকে ছাড়তেই হবে। কেননা এ-মাটি ও-মাটি কোনোটাই তার নিজের নয়, কোনোটাতেই তার কোনো দাবি নেই।

যাবার হুকুম এসেছে তা'র ওপর, তা'কে মান খুইয়েই চলে যেতে হবে। রাখু এও ব'লে গেছে, নতুন জায়গায় গেলে তুমি খেতে পাবে পেট ভরে —চাই কি একটা হিল্লেও হয়ে যেতে পারে আহুর মা।

আন্দাজে আন্দাজে আহুর মা আমানির পাত্রটা কাছে টেনে নিয়ে টাউ টাউ ক'রে খেতে লাগলো। ওর মধ্যে খুদ আর একটু নুনও মেশানো ছিল। তা'র জন্যে বালতি থেকে দু' খোস্তা খুদ আর আমানি না রেখে ভুবন বোরেগী গোয়ালে বালতি নেয় না। বোরেগীদের গোয়ালে আহুর মা অনেক সময় কচি কচি ঘাস জুগিয়ে আসে। এ হোলো তারই বিনিময়।

বুড়ির শীর্ণ গাল বেয়ে ঠোঁটের নীচে জলের ফোঁটা এসে জিভে লাগতেই বুড়ি সচেতন হোলো। এ জল ত' নুনগোলা আমানির নয়, —এ জল অন্য প্রকারের লবণাক্ত। বুড়ি তার কানির খুঁট দিয়ে এবার চোখ দুটো মুছলো। ঠানদির মাব শেষকালকার উপদেশগুলো আজ সকাল থেকে যতই মনে পড়ছে, বুড়ির চোখে ততই আসছে জল।

দিন দুই পরে রাখু এসে আবার দরজার কাছে দাঁড়ালো। হাতে তার একখানা নোটবই, আর সুতো বাঁধা পেন্‌সিল। সে ডাকলো, বুড়িমা? ও বুড়িমা।

বুড়ি প্রথমটা সাড়া দিল না। পরে বললে, মোড়ল নাকি গো?

হ্যাঁ, আজ ভিক্ষেয় বেরোও নি?

গা-গতর ব্যথা, তাই যাই নি।

ভাত পুঁজি আছে বুঝি?

বুড়ি এবার একটু উঠবার চেষ্টা করলো। বললে, আর একটা লোক এসেছিলো গো।

হ্যাঁ, সে আমারই প্যায়দা। বললে কিছু?

বুড়ি জবাব দিল না। রাখু বললে, এখানকার নম্বর পড়ে গেছে আর ত' সময় দিতে পারি নে, আদুর মা। কবে যাচ্ছ?

বুড়ি বিজ্ বিজ্ ক'রে বললে, তুমি বুঝি আর রাখতে পাল্লে না।

না গো। এবার গাঁইতি-কোদাল এসে পড়বে হু হু করে,—আমার কথা আর শুনবে না—রাখু বললে, শেষকালে কান্না কাটি করার চেয়ে ভালোয় ভালোয় যাওয়াই বুদ্ধির কাজ। তা' প্যায়াদা কি বললে গো?

বুড়ি এবারেও জবাব দিল না দেখে রাখু একটু সন্দেহ করলো। বললে, প্যায়দার হাতে পড়লে তোমার পুঁজিপাটা সব যাবে তা বলে দিচ্ছি। ও বেটা চোরের যাশু। তিন নম্বর বস্তিতে ঢুকে বেটা ধাপ্পা দিয়ে পাঁচ টাকা কামিয়েছে। আমি কিন্তু তোমার কাছে ঘুষ চাইনি, আদুর মা।

বুড়ি ক্ষীণকণ্ঠে বললে, প্যায়দা কি আসবে মোড়ল?

রাখু সন্দেহক্রমে এবার ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। বললে, আসবে না ত' যাবে কোথায়! বেটা উইপোকা। তুমি ওকে আস্কারা দিচ্ছ, কিন্তু পরে পস্তাবে। মেড়োর সঙ্গে কারবার করতে যেয়ো না বুড়িমা।

বুড়ি চুপ করে চোখ দুটো বুজে রইলো। রাখু তা'র দিকে একবার রোষকষায়িত দৃষ্টিতে তাকালো। স্বগতোক্তি ক'রে বললে, সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠবে না। মেড়োকে দিয়ে কাজ হাসিল করতে চাও, কেমন? ওটি হচ্ছে না!—আচ্ছা, আমিও রইলুম পাহারায়, প্যায়দার বাবাও তোমাকে বাঁচাতে পারবে না।

কি একটা মতলব আঁটতে আঁটতে রাখু তখনকার মতো চলে গেল। আতুর মা তা'র দরকারি কথাগুলোর জবাব দিল না, এতেই রাখুর সন্দেহ আরো ঘনিয়ে উঠলো। কিছু দূর গিয়ে সে থমকে দাঁড়িয়ে নিজের দাঁতে-দাঁতে চেপে বললে, মাগি জানে না কিছু। বুড়ি মাগি আর বুড়ি গাই,—এ থাকলেই বা কি, আর গেলেই বা কি! ভাগাড়েই ওদের জায়গা।

রাখুর সাড়াশব্দ আর পাওয়া যাচ্ছে না বুঝে আতুর মা একটু নড়াচড়া করলো। ভিক্ষের ছেঁড়া ঝুলিটা হাতড়ে হাতড়ে কাছে নিয়ে আন্দাজে ওর ভেতর থেকে তুলসীর মালাটা সে বা'র ক'রে নিয়ে হাতের মধ্যে রাখলো। আজ ভিক্ষে নেই, তবু মালাটা তা'র হাতেই থাক্। বুড়ো শিবতলার মেলায় গিয়ে সে দু'পয়সা দিয়ে এই মালাটা আনে,—তা প্রায় বছর পনেরো হোলো। দানাগুলোর রং কালো হয়ে গেছে, কিন্তু এই মালাটা ঘুরিয়ে সে ভিক্ষেও পেয়েছে অনেক। পেটটা যা হোক ক'রে চ'লে গেছে।

দেখতে দেখতে বৃষ্টি এলো অবেলার দিকে। আকাশের চেহারা দেখে মনে হয় না সে-বৃষ্টি সহজে ছাড়বে। গাঁয়ের এদিকটা হোলো নাবাল জমী,—সুতরাং অল্প বৃষ্টিতেই জল জ'মে ওঠে। আতুর মা'র মস্ত সুবিধে, তা'র কাছে শুকনো চারটি ভাত পুঁজি আছে,—কাল সকালে ভিক্ষের বেরোতে হবে না। বৃষ্টি বেশী হলে সাঁওতার বিল এমন ভ'রে ওঠে যে, ওদিকে পা বাড়াতে ভয় করে। বাউরীপাড়ার ওদিকের পথটা শুকনো, কিন্তু গোটা দুই বাঘা কুকুর তা'কে দেখলেই ক্ষেপে ওঠে—সুতরাং পারতপক্ষে ওদিকে সে হাঁটে না। আজ আর কাল—এ দু'টো দিন তা'র ভালোই কাটবে॥

কী বৃষ্টি সমস্ত সন্ধ্যায়! ঝড়ের হাওয়ায় সেই বৃষ্টির ঝাপটা ভিতর দিকে আসছে। চাটাইয়ের তলায় জল জমে উঠেছে। এক সময়,—তখন রাত্রি কত কে জানে—ঝন্ ঝন্ শব্দে গোবিন্দপালের দেওয়া সেই করোগেটের টুকরোখানা ঝড়ে খসিয়ে নিয়ে গেল। আওয়াজটা শুনে বুড়ীর আচমকা ঘুম ভেঙ্গে গেল। কাল সকালে জল ছেঁচে গিয়ে আবার ওই টুকরোখানা তাকে খুঁজে আনতে হবে।

কিন্তু পরদিন সকালেও আকাশের একই অবস্থা। আজ থেকে নাকি গাঁইতি-কোদালের কাজ আরম্ভ হবার কথা ছিল, কিন্তু এমন দুর্য্যোগে মুনিষ-কামিনরা কাজ করতে চাইবে কেন? সুতরাং আজও সব কাজ-কর্ম বন্ধ। সারাদিন ধরেই এ গ্রাম সাধারণত জনশূন্য থাকে। অন্যদিন যদি বা রাখু কিংবা পেয়াদার মতন দু'একজনকে দেখা যায়, আজ তারাও ঘর থেকে বেরোয়নি। সারাদিন ধরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি চললো।

বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল অবশ্য দ্বিতীয় দিনের শেষরাত্রে। সকালের দিকে পেয়াদা যখন জলকাদা বাঁচিয়ে এসে দাঁড়ালো তখন রোদ উঠেছে। এ পাশে ছিল একটা বনশিউলীর গাছ, এরই মধ্যে দু'চারটে শিউলী পড়েছে কাদার মধ্যে। সেদিকে একবার তাকিয়ে পেয়াদা হাঁক দিল, ও বুঢি, কোদালিরা আসিয়েছে কাম করতে,—কামরা ছাড়িয়ে দাও।

রাখু বোধ হয় দূরে কোথাও ওৎ পেতে ছিল। ছুটতে ছুটতে এসে বললে, এই,—খবরদার।

পেয়াদা মুখ ফিরিয়ে তাকালো। রাখু বললে, আমি রিপোর্ট করবো জানিস্? আমার চেনা লোকের কাছে ঘুষ খাস?

ঘুষ!—পেয়াদা আগুন হয়ে উঠলো। বললে, কোন্ হারামি? তুম্হি দেখিয়েছে আঁখোসে?

রাখু বললে, আমার কাছে চালাকি মারছিস?

খবরদার, বেইমান!—পেয়াদা তাকে ধমক দিল।

হুজনে মারামারি বাধে আর কি! এমন সময় একজন জংলী কোদালী কোদাল কাঁধে নিয়ে এসে ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে বললে, এই জমাদার, ঘরকে ভিতর মুর্দা আছে!

মুর্দা কিরে বেটা?—রাখু ঝগড়া থামিয়ে এবার এগিয়ে এলো। দেখলো, বেড়াটা কাৎ হয়ে পড়েছে এবং তারই ভিতর দিয়ে আদুর মা সপ্সপে ভিজে দোলাই জড়িয়ে প'ড়ে আছে। কোনপ্রকার সাড়া শব্দ নেই। ঘুম নয়, ঘুমের চেয়ে বড় কিছু। মুখখানা বীভৎস বিকৃত, দু-তিনটে অবশিষ্ট দাঁত বেরিয়ে পড়া।

পেয়াদা মহাস্ফূর্তির সঙ্গে বলে উঠলো, রাখু, দেখছিস, বুড়ি মোরবার আগে হাসিয়েছিল! হাসিমুখ রে!

রাখু শুধু বললে, হুঁ। হাসিই বটে!

কিন্তু তা'র বিশ্বাস হোলো না যেন। কাছে গিয়ে রাখু আলগোছে আদুর মার বুকের কাছে অনেকক্ষণ কান পেতে পরীক্ষা করলো। না, মিথ্যে নয়। ঘড়ির কাঁটা কখন যেন চলতে চলতে বন্ধ হয়ে গেছে।

পেয়াদা বাইরে রৌদ্রে দাঁড়িয়ে সকৌতুকে ভিজে সাঁপিটা জড়িয়ে গাঁজার কল্কেটা ধরিয়েছিল। রাখু যখন বাইরে এসে একপাশে চুপ করে দাঁড়ালো, পেয়াদা তা'র দিকে হাসিমুখে একবার তাকিয়ে

কল্‌কেটায় সুদীর্ঘ গোটা দুই টান দিল। তারপর বললে, ভাবিস না কুন্ধু, ভগোয়ানকে মর্জি রে ভাই রাখু।—নে ধর—

আড়ষ্ট হাতে রাখু কল্‌কেটা ধরে নিল।

আলো

মহানগরের উপকণ্ঠে কোন এক অখ্যাত পল্লীর প্রান্তে এই বৃহৎ বাড়ীটির ভগ্নাবশেষকে এককালে অট্টালিকা বললে হয়ত ভুল হোতো না। বাড়ীটি ছিল তিন মহলা, এখনও আন্দাজ করা কঠিন নয়। কিন্তু ইমারতের আরম্ভ এবং শেষ কোথায় তা আজও ঠাহর করা শক্ত। চারিপাশে মস্ত বাগান আর গাছপালা, এখানে ওখানে ভগ্নস্তূপের জটলা, সদর-অন্দরের মাঝখানে নানা অলি-গলি, অন্দি-সন্ধি। কোথাও বোল্‌তা আর মৌমাছির চাক, কোথাও চামচিকা আর বাদুড়ের বাসা, আবার কোথাও বা গোলা পায়রা আর কয়েকটা ঘুঘু স্বচ্ছন্দে তাদের আবাস নির্মাণ করে নিয়েছে। এই অঞ্চলের লোক প্রায় সকলেই জানে, বিষধর সাপের বাসা আর শৃগালের কোটরের জন্য এই বিশাল বাড়ীটি কুখ্যাত। কেউ কেউ বলে, একশো বছরের মধ্যে এ বাড়ীতে কোনো মানুষ বাস করেনি। বিস্তৃত বাগানের প্রান্তে ভাঙ্গা সীমানা-প্রাচীরের ভিতর দিয়ে যারা সহজ পথ বানিয়ে বাড়ীটির ধার দিয়ে আনাগোনা করে, তারা অনেকেই বলে একশো বছর না হোক, পঞ্চাশ বছর ত বটেই।

কথাটা কিন্তু সত্য নয়। এ বাড়ীর সর্বশেষ মালিক বিমলাক্ষ এই সেদিনও তার অন্তিম শয্যা পেতে এই ভগ্নস্তূপের মাঝখানে কোন্ একটা কক্ষে তার শেষ নিঃশ্বাস ফেলে গিয়েছে। সে-ই ছিল এখানকার শেষ প্রদীপ। সে আজ মাত্র বছর দশেকের কথা। আজ সন্ধ্যায় তারই মৃত্যুবার্ষিকী পালন করার জন্য একটি ছোটখাটো সভার আয়োজন করা হয়েছিল।

এ পল্লীর কোন লোক বিমলাক্ষর আসল পরিচয় বিশেষ কিছু জানতো না। মৃত্যুতিথি পালনের জন্য যারা এসে জড়ো হয়েছে তারা প্রায় সবাই বাইরের লোক এবং এককালে তারাই ছিল বিমলাক্ষর অন্তরঙ্গ। বিমলাক্ষ বিবাহ করেনি এবং পুরুষের পক্ষে যা আরও বিচিত্র, জীবনে উপার্জনও কখনো করেনি। তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হোলো গোটা দুই ভাঙ্গা আলমারী জোগার করে কয়েকখানা বই সংগ্রহ করে রাখা এবং তারই শয়নকক্ষের এক প্রান্তে একখানা ছেঁড়া মাদুর পেতে পাড়ার চার পাঁচটি নাবালককে লেখাপড়া শেখানো। কোন্ বিদ্যা কাকে সে শিখিয়েছিল কে জানে, কিন্তু সেই নাবালকদলের থেকে একটি ছেলেই নাকি আজকের এই সভার আয়োজন করে বিমলাক্ষর কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে খবর দেয়।

ব্যাপারটা হাস্যকর সন্দেহ নেই। দেশের বড় বড় রথী-মহারথীর জন্মতিথি আর মৃত্যুবার্ষিকীতে আজকাল লোক জড়ো হতে চায় না। এযুগে বীরত্ব খ্যাতি কীর্তি কতদিকে কত মিথ্যা হয়ে চলেছে, প্রচলিত বিশ্বাস আর নীতিবোধ ভেঙ্গে যাচ্ছে মানুষের মনে, সংশয়ের থেকে জন্ম হচ্ছে অবিশ্বাসের,—সুতরাং অখ্যাত নগণ্য বিমলাক্ষর মৃত্যুতিথি পালনের এই ছেলেমানুষী মতিভ্রমের অর্থ কি হতে পারে, এ নিয়ে অনেকের মনেই প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু যারা আজকের এই ক্ষুদ্র সভার আয়োজন করেছিল, তাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা অনুরাগ এবং অধ্যবসায়ের প্রবাহে এ প্রশ্ন ভেসে গিয়েছিল।

চারিদিকের গাছপালা আর ঝোপজঙ্গলের চক্রাকার এই প্রাচীন ভিটাকে বছরের প্রায় সমস্ত সময়টাই একরূপ লোকচক্ষের অন্তরালে রেখে দেয়। আজকে হঠাৎ তার এক প্রান্তের একটি কক্ষে কেমন করে

ইলেকট্রিকের আলো জলে ওঠে, কেমন করে জনসমাগমের গুঞ্জন শোনা যায়, কেমন করে শবদেহের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন ধুক ধুক করে,—এ বিস্ময় অনেকের পক্ষেই সামান্য নয়। সুতরাং অভ্যাগত এবং নিমন্ত্রিত কয়েকজন লোক ছাড়াও আশপাশের অনেকগুলি লোক অসীম কৌতূহল নিয়ে এই বিপজ্জনক জঙ্গলজটলার এখানে ওখানে ভীড় করে দাঁড়িয়ে গেছে। স্থানীয় লোকেরা মনেও রাখেনি বিমলাক্ষকে, কিন্তু বাইরের লোকের মনে তার মৃত্যু আজও ঘটেনি। কেন ঘটেনি, কেমন প্রকৃতির লোক ছিল বিমলাক্ষ, কোন্ অমৃতের আশ্বাস সে রেখে গেছে বন্ধুসমাজে, কোন্ অবিনশ্বর কীর্তির অধিকারী সে, কি জন্য সে মহৎ, কেন তার জন্য মন কাঁদে,—এই সব প্রশ্নের উত্তর আজকের সভায় হয়ত পাওয়া যাবে!

বাগানের পশ্চিম দিকের চওড়া রাস্তাটা সোজা চলে গেছে কলকাতার মাঝখানে। হাল আমলের নতুন ফ্যাশনের বড় বড় বাড়ীগুলি সবে-মাত্র দুধারে তৈরী হয়েছে। ওই পথেরই কোন এক বাগান বাড়ীর মালিক বিমলাক্ষদের এই বাগানবাড়ীটি আত্মসাৎ করার চেষ্টায় ছিলেন। সুতরাং তাঁরই সাহায্যে বিমলাক্ষর উৎসাহী ছাত্রটি অনেকদূর থেকে ইলেকট্রিকের তার টেনে এনে আজকের সভাটিকে আলোকিত করেছে। যদিও ব্যাপারটা বে-আইনি, তবুও উৎসাহের অভাব ঘটেনি। ছোকরার কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে সন্দেহ নেই।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ, বোধহয় সেটি শুক্লপক্ষের সন্ধ্যা। দূরের থেকে সভার আয়োজনটি দেখলে মনে হতে পারে, বিশালকায় প্রেতের একটি চক্ষু যেন আজ হঠাৎ জ্বল জ্বল করে উঠেছে। আশ্চর্য, এরই মধ্যে তিন চারখানা চকচকে মোটর এসে দাঁড়িয়েছে ওর পাশে। এসেছেন

কয়েকজন অভিজাত সমাজের মহিলা, এসেছেন জনকয়েক সাহেবী ধরণের ব্যক্তি। আসরের এক প্রান্তে স্বর্গত বিমলাক্ষর একখানা ছবি,—সে ছবিটি শান্ত, মুখচ্ছবি স্নিগ্ধ। বিমলাক্ষর শুচিশুদ্ধ জীবনে যেমন কোনো মালিন্যের স্পর্শ লাগেনি, ছবিখানিও ঠিক তেমনি।

কয়েকটি ধূপ জ্বলছে ছবিটির দুই পাশে, কাছেই একটি পাত্রে একরাশি যুঁই ফুল, তারই পাশে একগোছা রজনীগন্ধার ডাঁটা, কয়েকখানি বই। সভাস্থ নরনারীর শান্ত নীরবতা লক্ষ্য করবার বিষয়। দশ পনেরো বছর আগে যারা ছিল বিমলাক্ষর অন্তরঙ্গ,—আজ তাদের অনেকেই উপস্থিত, অনেকেই সন্তান-সন্ততির জনক, অনেকে মস্ত সংসারের প্রতিপালক। কারো চুল পেকেছে, কারো ললাটে ফুটেছে বলিরেখা, কারো কালি লেগেছে চোখের কোলে। মেয়েদের অনেকেই বয়সের আড়ালে আত্মগোপন করেছেন। কারো মুখে রং, কারো পাউডার, কারো পরিচ্ছদের চাকচিক্য, কারো বা মুখে সেই পনেরো বছর আগেকার অম্লান পরিচ্ছন্নতা। কিন্তু একটা যুগ মাঝখানে পেরিয়ে গেছে। কত যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাষ্ট্রবিপ্লব, মড়ক মহামারী, কত আশ্চর্য পরিবর্তন কত সমাজে,—কিন্তু তবু সেই খ্যাতিহীন, কীর্তিহীন বিমলাক্ষর প্রতি ওদের শ্রদ্ধানুরাগ কমেনি। কেন কমেনি? কী ছিল বিমলাক্ষর চরিত্রে? কোন্ মন্ত্র সে দিয়ে গেছে? তার জন্য কতকগুলি নরনারীর কেন এই আকুলতা? কেন আজ হৃদয়ের ভিতর থেকে কান্না ওঠে তার বিরহে?

বিমলাক্ষ নাকি সত্যনিষ্ঠ ছিল, লোভ এবং আসক্তিকে সে নাকি কখনো আমল দেয়নি। সামান্য কাজ করতো সে বিনা পারিশ্রমিকে,

কিন্তু কোনদিন খ্যাতির পিছনে সে ছোটেনি! সে নাকি স্বপাক অন্ন গ্রহণ করতো এবং তার ব্রত ছিল নাকি সন্ন্যাস!

সন্ন্যাস! হঠাৎ কোনো বন্ধুর চোখে পড়লো আসরের পিছনের দিকে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রমীলা। বিমলাক্ষর সন্ন্যাসের সঙ্গে প্রমীলার যোগ কতটুকু, বিমলাক্ষ কেন সংসার রচনা করেনি, নগরের কোলাহল থেকে দূরে এসে কেন সে নিঃসঙ্গ নিভৃত অন্তিমকাল অতিক্রম করে গেছে, এর সঠিক জবাব আজ কি প্রমীলার কাছ থেকে পাওয়া যেতো? শোনা যায়, বিমলাক্ষর স্বভাবের শুচিতা, সত্যনিষ্ঠা এবং চরিত্রবত্তার জন্য প্রমীলা নাকি অনেকখানি দায়ী; শোনা যায়, প্রমীলা নাকি বিমলাক্ষকে তার আশ্চর্য ব্রতচারণে নিত্য অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। এও শোনা যায়, বিমলাক্ষর অন্তিমকালে প্রমীলা নাকি এক আধবার এসে লোকচক্ষের আড়ালে তাকে দেখে গিয়েছিল। কিন্তু সেও দশ বছরের কথা। কে মনে রেখেছে এতকাল পরে সেই কাহিনী? বিমলাক্ষর জীবনরহস্যের মূলে এই নারীর কোন্ দুর্লভ প্রতিভা নিহিত ছিল, কেই বা তার খবর রাখে?

সভায় একটি গান হয়ে গেল। গানের সেই করুণ মূর্চ্ছনা যেন মৃত্যুর থেকে অমৃতলোকের দিকে। গানের পর কে যেন করুণ কাতর ভাষণে দুই একটি কথা বিমলাক্ষর সম্বন্ধে বলতে লাগলেন। বিমলাক্ষ ছিল সৎ ও আনন্দময়, ছিল মহৎ, ছিল সত্যবাদী। এ যুগে কি পাওয়া যায় তেমন লোক? সত্যিকার কি কাঁদে কারো মন পরের জন্য? কেউ কি মনেপ্রাণে নিষ্পাপ আছে একালে? কেউ জয় করেছে লোভ? কেউ ত্যাগ করেছে আসক্তি? এ যুগের মালিন্যজর্জর জীবনের থেকে

কি কেউ নিত্য চিত্তগ্লানিকে সরিয়ে রাখতে পারছি? ভয়, সংশয়, অশ্রদ্ধা, ঘৃণা—এদের গ্রাস থেকে আজ মুক্তি নেওয়া কি সম্ভব হচ্ছে?

কা গভীর শ্রদ্ধা সকলের প্রমীলার প্রতি। এই নারী আজ সকলের প্রণামের যোগ্য। এর মধ্যে কেউ কেউ জানে, যদি কোনোদিন বিমলাক্ষ বিবাহ করতো, তবে প্রমীলাই হতেন বিমলাক্ষর সহধর্মিণী। চিরকৌমার্য ব্রতধারিণী এই মহিলা সেই সন্ন্যাসী বিমলাক্ষর জীবনে কিছু আলোকসম্পাৎ করতে পারেন, এই দৃঢ় বিশ্বাস সভায় অনেকেরই আছে। সুতরাং এই অন্তরঙ্গ আসরে শ্রীযুক্তা প্রমীলাকে দুই একটি কথা বলার জন্য অনুরোধ জানানো হোক!

হঠাৎ একটি ঘটনা ঘটলো। বাইরে ঝড় বৃষ্টির একটা আয়োজন চলছিল, এতক্ষণ জানা যায়নি। এক ঝলক বাতাস আসতেই সহসা ইলেকট্রিকের আলোটা দপ করে নিবে গেল। এই ভগ্ন প্রাচীন পুরীর একাংশের এই আসরটি যদি বা একটু আলোকিত হয়েছিল, একটু সাহস পাওয়া গিয়েছিল,—কিন্তু এই আকস্মিক দুর্বিপাকের ফলে আবার যেন সেই প্রেতলোকের ঘন নিরেট অন্ধকার সমস্তটাকে একাকার করে দিল। যাঁদের সঙ্গে মোটর ছিল, তাঁদের দুর্ভাবনার কারণ নেই, কিন্তু যাঁরা বহুদূর থেকে এই সভায় এসেছেন, তাঁরাও শান্ত ও আত্মসমাহিত-ভাবে বসে রইলেন। কক্ষের মধ্যে বিরাজ করছে যেন করুণ মধুর শান্তি।

কেরোসিনের আলো অপেক্ষা মোমবাতি ভালো এই কথা অনেকে বললেন। আলোটা সহসা নিবে যেতে পারে একথা উদ্যোক্তাদের মনে ছিল না, সুতরাং হাতের কাছে মোমবাতিও তারা রাখেনি। এতক্ষণ পরে সজাগ হয়ে তারা অনেকেই মোমবাতির জন্য চেষ্টা করতে

গেল। দোকানদানি এখান থেকে অনেক দূরে, বাজার তার চেয়েও দূরে। কিন্তু তা হোক দুটি ছেলে বাগান পেরিয়ে ছুটতে ছুটতে চলে গেল। কেউ কেউ ইলেকট্রিকের আলোটা ঠিক করে দেবার চেষ্টা করলো, কিন্তু লাইনটায় কোথায় যে গোলমাল ঘটেছে ধরা গেল না।

অন্ধকারে সকলেই নিঃশব্দে বসেছিলেন। এপাশে বসেছেন মোহিত সেন, দেবেন রায়, মন্মথ লাহিড়ী এবং তাঁর স্ত্রী লীলা। তাঁদের পাশে বিমলাক্ষর দুই একজন আত্মীয়। ও-পাশে বসে রয়েছে বিমলাক্ষর আর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু অজিনেন্দ্র রায়। অজিনেন্দ্র গত যুদ্ধে গিয়েছিল ইরাণদেশে। সেখান থেকে নাকি সুদূর প্রাচ্যে। কত দেশে সে দেখে এসেছে মৃত্যুর দাপদাপি, সর্বনাশা ধ্বংসের চেহারা, প্রভুত্ব-লাভের অবিরাম সংগ্রাম। সে অজিনেন্দ্র আর নেই, যে ছিল বিমলাক্ষর অন্তরঙ্গ বন্ধু। অজিনেন্দ্র এখন মোটা চাকরি করে, অনেক টাকা উপার্জন করে, অনেক প্রকার জীবনের অভিজ্ঞতা তার। সেই দরিদ্র অজিনেন্দ্র এখন মোটর হাঁকায়, টেলিফোনে কথা কয়, পরণে তার বুশ-শার্ট, হাতে ব্ল্যাক-এণ্ড-হোয়াইটের টিন, দেহরক্ষী তার সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু তবু আজকের এই স্মৃতিসভায় বিমলাক্ষর প্রতি অসীম শ্রদ্ধা নিয়ে সে এসেছে, একথা জেনে এসেছে তার জীবনের সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধেয়া নারী প্রমীলার পদার্পণ এই সভায় ঘটবেই। আজ পরম সত্যাশ্রয়ী বিমলাক্ষর মৃত্যুতিথিতে পরম নিষ্ঠাবতী প্রমীলার দর্শন মিলবেই।

প্রায় আধঘণ্টা পরে কয়েকটি মোমবাতি নিয়ে সেই ছেলে দুটি ফিরে এলো। আলোটা হঠাৎ নিবে গিয়ে যে সুরভঙ্গ হয়েছিল, মোমবাতি

জ্বালবার পরও মিনিট দুই গেল নতুন করে সেই আবহ সৃষ্টি করতে। পাঁচটি মোমবাতি একত্র জ্বালানো হোলো। কিন্তু তার আলো অতি মৃদু, অতি ক্ষীণ মনে হয়। আবছায়াময় কক্ষ, কেমন যেন ছায়াচ্ছন্নতা প্রাচীন দেওয়ালগুলিতে, কেমন যেন ভগ্নস্তূপের অদ্ভুত গন্ধ চারিদিকে। যেন এখানে প্রেতলোক আর নরলোকের সন্ধিস্থল, অর্ধসত্য আর মিথ্যায় যেন রহস্যময়, এখানে যেন একটা ক্ষীণ দৃষ্টি সংশয়াচ্ছন্ন যুগসন্ধির সংযোগ ঘটেছে। অত্যুগ্র আলোয় যে সকল নরনারীকে সত্য ও বাস্তব বলে জানা ছিল. এই প্রাচীন পটভূমির স্বল্পালোকিত কক্ষে তাদের প্রত্যেকে যেন অস্পষ্ট ছায়াময়, অসত্য ও অসম্পূর্ণ হয়ে দেখা দিল। আর যেন তাদেরকে নির্ভুলভাবে চেনা যাচ্ছে না। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের চেহারা লক্ষ্য করে একপ্রকার অস্বস্তিবোধ করতে লাগলো। অন্ততঃ. আর কিছু না হোক, এ সভার কাজ তাড়াতাড়ি শেষ হলেই তা'রা খুশী হয়। বাইরে বনচ্ছায়ার অন্ধকার, মেঘমলিন আকাশে বৃষ্টির আভাস. ভিতরে মৃদুকম্পিত ভীরু প্রদীপের মলিন আভা—এর থেকে বেরিয়ে নগরের আলোকিত কোলাহলের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াতে পারলে ভালোই লাগবে সন্দেহ নেই।

শ্রীযুক্তা প্রমীলা দেবী এবার বিমলাক্ষর সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলবেন এজন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন। সত্য বলতে কি, সর্ব্বপ্রধান আকর্ষণ হোলো ওইটি। প্রমীলা জীবন-তপস্বিনী, প্রমীলা তেজস্বিনী, —সত্যের ঝলক একদা প্রমীলার কণ্ঠে ঠিক ঝলসে উঠতো। সাধারণ মেয়ে তিনি নন, সাধারণ বুদ্ধি নিয়ে তিনি চলেন না। বিমলাক্ষর মৃত্যুর পর কাকে যেন তিনি একখানা চিঠি লিখে জানিয়ে যান, আর কোনোদিন আমার খোঁজ নিয়ো না। আমি যেখানেই থাকি তোমাদের

অবশ্যই মনে রাখবো, কিন্তু তোমরা আর কোনোদিন আমাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করো না।

এর পর যুদ্ধ বেঁধে উঠলো ইউরোপে। উঠে দাঁড়ালো শয়তান,—অসুরের তাণ্ডব চললো দিকে দিকে। কত নৃশংসতা, অন্যায়, দুষ্ট চক্রান্ত, কত মনুষ্যত্বের বিকৃতি, কত মিথ্যা আর ভণ্ডামীর অভিযান—এই দশ বছরে ঘটে গেল। কিন্তু আর কোনোদিন প্রমীলার দেখা পাওয়া যায়নি।

কী অধঃপতন সভ্যতার, স্বভাবের কী নোংরামি, কত নীচে নেমে গেল বিমলাক্ষ আর প্রমীলার দেশের লোকরা। দুর্গতির মধ্যে ডুবে গেল, তলিয়ে গেল প্রলোভনের তলায়, নোংরামিতে পাঁকের মধ্যে কিল-বিল করতে লাগলো। ওই ত' ওরা—মোহিত সেন, দেবেন রায়, মন্মথ লাহিড়ী। ওই ত আবছায়া ঘেরা রিনি চৌধুরী, এনা গুপ্তা, ইরা সেন। ওই রয়েছেন লিপ্-ষ্টিক্ আর রুজমাখা কমলা রায়—যাঁর নাম রটে গিয়েছিল দেশের ঘরে ঘরে। ওই ত এসেছে রঞ্জিত তার সর্বশেষ প্রণয়িনীটাকে সঙ্গে নিয়ে। আজ কিন্তু সবাই চুপ—কেননা আজ প্রমীলার দর্শন পাওয়া গেছে। প্রমীলার দুর্লভ ব্যক্তিত্বের কাছে সবাই যেন আজ ছোট হয়ে যাচ্ছে।

অজিনেন্দ্র উদ্গ্রীব হয়ে বললেন, এবারে প্রমীলা দেবী দু'একটি কথা বলবার পর আমাদের সভার কাজ শেষ হতে পারে।

কিন্তু প্রমীলা তখন কোথা? অজিনেন্দ্র উঠে দাঁড়ালো। প্রমীলা যেখানে বসেছিলেন সেখানে তিনি নেই। পাশের মহিলাটি বললেন, হ্যাঁ, আমারই পাশে তিনি মাথা হেঁট ক'রে চুপচাপ বসেছিলেন।

তারপর হঠাৎ আলোটা নিভে যেতেই তিনি বললেন, আমি আলো এনে দিচ্ছি।—এই বলেই তিনি উঠে গেছেন। কই, আর ত' ফেরেননি?

কতক্ষণ গেছেন?

আধঘণ্টারও বেশী।

অজিনেন্দ্র একটু হতচকিত হয়ে বললেন, কই, আমরা ত' কেউ তাঁকে যেতে দেখিনি। কোথায় গেছেন বলতে পারেন?

মহিলাটি বললেন, আমি কেমন ক'রে বলবো বলুন!

কিন্তু……মানে, কোন্ পথ দিয়ে গেলেন তিনি?

মহিলাটি আর কোনো জবাব দিতে চাইলেন না। অজিনেন্দ্র বললেন, বন্ধুগণ, প্রমীলা দেবী আলো আনতে গেছেন কিন্তু এখনও ফিরলেন না কেন বুঝিনে। তা ছাড়া এ অঞ্চলে তাঁর জানাশোনা কোথাও কিছু নেই। তিনি কোথা থেকে আলো আনতে গেলেন, সেটা একটু আশ্চর্য বৈ কি। অথচ গেছেন তিনি, আধ ঘণ্টারও বেশী। বনবাগান পেরিয়ে তাঁর পক্ষে কতদূর যাওয়া সম্ভব বলতে পারিনে।

অজিনেন্দ্রর কথায় সভায় একটু চাঞ্চল্য দেখা গেল। প্রমীলা গেছেন অনেকক্ষণ,—এখনও দেখা নেই। এ অঞ্চল তাঁর অপরিচিত; হঠাৎ এই অন্ধকার বাগানের ভিতর দিয়ে তিনিই বা আলো আনতে গেলেন কেন, এটা বিস্ময়ের কথা বৈ কি। সভার উদ্যোক্তারাও তাঁকে বেরিয়ে যেতে দেখেনি। শুধু তাই নয়, তিনি প্রথম থেকেই সকলের পিছনে আত্মগোপন ক'রে এমনভাবে বসেছিলেন যে, অনেকেই তাঁকে লক্ষ্য করেনি। নিতান্ত যে কয়জন প্রমীলাকে অন্তরঙ্গভাবে দশ বছর আগে দেখেছেন, তাঁরা ছাড়া প্রমীলা অপর কারো কাছেই পরিচিত নন্। ব্যাপারটা এবার যেন একটু অস্বস্তিকর রহস্যে ভ'রে উঠলো

সভার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হতচকিত অজিনের সবিস্ময় কৌতূহলের আর শেষ নেই। প্রমীলা এখানে এসেছিলেন বহুদূর থেকে। এসেছেন একা, যেতেও হবে তাঁকে একা। সঙ্গে কোনো যানবাহন নেই, সঙ্গী-সাথী নেই। সভার শেষে একে একে সকলেই বিদায় নিল। কিন্তু অজিনের পক্ষে অত সহজে বিদায় নেওয়া সম্ভব ছিল না। সকলের পরে একটি মোমবাতি হাতে নিয়ে বিমলাক্ষর একটি ছাত্রকে সে বললে, এসো ত' ভাই একবার আমার সঙ্গে ?

কোথায় যাবো, বলুন ?

এই বাড়িটা একবার ঘুরে দেখতে হবে।

কী বলছেন আপনি! ভেতরটা একেবারে দুর্গম, সাপখোপে ভরা। কেউ যায় না ভেতরে।

অজিন বললে, কিন্তু আলো আনতে তিনি গেলেন কোথা ? একা মেয়েছেলে, এত রাত্রে! আমি ত' আর চুপ ক'রে চলে যেতে পারিনে, ভাই। তিনি কি বড়রাস্তার দিকে গেছেন ?

ছেলে দু'টি বললে, আমরা ত' বরাবরই এখানে আছি, কারোকেই বেরোতে দেখিনি। আমরা রাস্তা দেখিয়ে না দিলে এখানথেকে বেরোনো কারো পক্ষেই সম্ভব নয়, অজিনবাবু।

অজিন কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর মোমবাতির আলোয় মুখ তুলে বললে, তাহ'লে দুটো জিনিষ আমাকে বিশ্বাস করতে হয়। হয় তিনি আজ একেবারেই আসেননি, নয়ত তাঁর ডানা গজিয়েছিল, ডানা মেলে তিনি উড়ে গেছেন, কিন্তু দুটোই সত্যি নয়, কেননা আমার মতো আরও তিন চারজন স্বচক্ষে তাঁকে ব'সে থাকতে

দেখেছেন। আচ্ছা, এটা কি সম্ভব, তিনি ঘর থেকে বেরোতেই তাঁকে বাঘে ধরে নিয়ে গেছে ?

একটি ছেলে বললে, তিনি সশরীরে অন্তর্ধান করেছেন বরং বিশ্বাস করবো, কিন্তু বাঘে ধরেনি। বাঘ এদিকে নেই।

অজিনেন্দ্র উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে চারিদিকে তাকাতে লাগলো। আকাশ ততক্ষণে কিছু পরিষ্কার হয়েছে, জ্যোৎস্না দেখা দিয়েছে। সভাকক্ষের ভাঙ্গা দরজাটা সেদিনবার মতো বন্ধ ক'রে একটি ছেলে এবার এগিয়ে এসে বললে, আপনার সঙ্গে গাড়ী ছিল, আপনি ত' সহজেই প্রমীলা দেবীকে পৌঁছে দিতে পারতেন ?

অজিন শান্ত কণ্ঠে বললে, সে ভাগ্য আমার নয়, ভাই।

কিন্তু এখানে আর দাঁড়িয়ে লাভ কি ? তার কোন চিহ্নই ত' দেখা যাচ্ছে না ! তা ছাড়া তিনি যদি ফিরতেন, তাঁর হাতে আলোই ত' থাকতো !

তাঁর খোঁজ না ক'রেই চ'লে যাবো ?
—অজিন ব্যাকুলতা প্রকাশ করলো।

কোথায় খুঁজবেন ? তিনি ত' ছেলেমানুষ নন্‌! এমনও নয় যে, তিনি কোথাও লুকিয়ে আছেন !

অজিন ধীরে ধীরে এসে তা'র গাড়ীতে উঠে বসলো। ছেলে দু'টি আর যেন থাকতে চাইছিল না। অজিন বললে, আচ্ছা ভাই তোমরা যাও, তোমাদের রাত হয়ে যাচ্ছে !

আপনি ?

আমার ত' গাড়ীই আছে, চ'লে যেতে পারবো !

ছেলে দু'টি নিশ্চিন্ত হয়ে এবার চ'লে গেল। তাদের ধারণা প্রমীলা চ'লে গেছেন অনেক আগেই। প্রমীলার পক্ষে এইপ্রকার অসামাজিকভাবে চ'লে যাওয়া সম্ভব কি না, একথা তারা ভেবে দেখলো না।

অন্ধকারে গাড়ীর মধ্যে দীর্ঘক্ষণ অজিন ব'সে রইলো। আলো আনতে গেছেন প্রমীলা, আলোটা তাঁর হাতে থাকবে,—এই বিশ্বাস নিয়েই অজিন ব'সে থাকলো। সিগারেট ধরালো একবার, সেই আলোয় ঘড়িতে দেখলো রাত নয়টা বেজে গেছে। ভগ্ন প্রাচীন প্রাসাদের ভিতর থেকে নানা অদ্ভুত কীটপতঙ্গের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। জনহীন পুরী, কিন্তু ভিতরে বিচিত্র অগণ্য প্রাণীদলের সংসার। ইঁট কাঠের ফাটলে, সুড়ঙ্গে, মাটির নীচে, কোটরে জঠরে অসংখ্য জীবনের জটলা। অজিনও সেই দিকে তাকিয়ে নিশ্চল হ'য়ে ব'সে রইলো।

আলোটা এসে পৌঁছবে, এ আশ্বাস কম নয়। সেই আলোয় দশ বারো বছর আগেকার প্রমীলাকে সে চিনে নেবে। জীবনে মিথ্যা বলেনি, পাপ করেনি, লোভ আর আসক্তিকে আমল দেয়নি,—শুচিস্বভাবকে লালন ক'রে এসেছে প্রমীলা এযুগের সমস্ত মালিন্যের থেকে দূরে গিয়ে,—তা'কে এতকাল পরে একবার দেখে নেওয়া দরকার বৈ কি। তা ছাড়া, সত্যি বলতে কি, স্মৃতি-সভায় বিমলাক্ষর স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তা'র অনেকখানিই সত্যি নয়। বিমলাক্ষর নানা বদ্ অভ্যাস ছিল, নানাপ্রকার কুক্রিয়ায় সে অনেক সময় লিপ্ত থাকতো। এমন মাঝে মাঝে মনে হয়েছে তাকে হয়ত আর ভালো পথে ফিরিয়ে আনা যাবে না। কিন্তু ওই প্রমীলা, তাদের কলেজের সেদিনের সহপাঠিনী,—প্রমীলা চিনতে পেরেছিল বিমলাক্ষর মধ্যে খাঁটি ধাতু। কী যেন মন্ত্র সেদিন প্রমীলা উচ্চারণ করেছিল,—বিমলাক্ষ দেখতে দেখতে নতুন পথে বাঁক নিল।

আশ্চর্য বিমলাক্ষর সেই পরিবর্তন, সেই বিচিত্র রূপান্তর। সে বন্ধুদের ছাড়লো, ছাড়লো তাঁর সেই সমাজ, ছাড়লো তার পক্ষে নিন্দনীয় যা কিছু। সোজা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে চ'লে এলো এই প্রাচীন ভগ্নস্তূপের জটলার মধ্যে।

শৃগালের ডাকে অজিনের চমক ভাঙ্গলো। এখানে এমন ক'রে থাকার আর কোন হেতু নেই। বারো-তেরো বছর ধরে যে-প্রমীলার কোনো খবর সে পায়নি, যেমন সে একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল, আজও তেমনি পলকের জন্য দেখা দিয়ে সে আবার গা ঢাকা দিল। তার জীবনে এবারও একটা অদ্ভুত বিস্ময় জমা রেখে সে চলে গেল।

হাতঘড়িতে অজিন দেখলো রাত দশটা বেজে গেছে। অন্ধকারে গাড়ী নিয়ে বসে থাকা বাতুলতা। অজিন এবারে মোটরে ষ্টার্ট দিল। তারপর আস্তে আস্তে খানিকটা পিছনে হটিয়ে সে গাড়ী ঘুরিয়ে স্পীড দিল। তার নিজের পরিচয়টাও কি খুব গৌরবের? ওই যে মোহিত সেন আর দেবেন রায়রা আজ এসেছিল, ওরা কি আজ নিজেদের কাছেই যথেষ্ট সম্মান পাচ্ছে? ওদের হাত কি পরিচ্ছন্ন? ওরা কি নোংরা ঘাঁটে নি? সে নিজে উঠলো কেমন করে? কাদের সে মাড়িয়ে এসেছে দুই পা দিয়ে? কাদের রক্ত মেখে এসেছে সে দুই হাতে? মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু, হৃদয়বৃত্তির অপমান—লোভের আর দুষ্প্রবৃত্তির অলজ্জ আস্ফালন! এই যে সংশয় আর নৈরাশ্য এসেছে তার মনে, এর থেকে মুক্তির সন্ধান কি দিতে পারতো প্রমীলা? দিতে পারতো কি জীবনের কোন নতুন আস্বাদ?

গাড়ী ছুটিয়ে অজিন চললো শহরের দিকে। শহর অনেক দূরে। যত দূরেই হোক, যেখানেই হোক, প্রমীলার কোন একটা খবর তাকে নিয়ে যেতেই হবে। আজ বিমলাক্ষর স্মৃতিসভার সকলের বড় আকর্ষণ

বিমলাক্ষর তর্পণ নয়—প্রমীলার দর্শন পাওয়া। প্রমীলা তার কাছে একটা আইডিয়া, তার পথের একটা সঙ্কেত, তার অন্তঃস্থলের একটা ইচ্ছামাত্র।

অজিন গাড়ী ছোটালো। যত জোর আছে তার মনে, যত শক্তি আছে মোটরের—অজিন সমস্তটা একত্র করে গাড়ীর গতিবেগ বাড়িয়ে দিল। আশেপাশে পিছনে কোথাও তার তাকাবার প্রয়োজন নেই, সামনে কোনো বাধা আছে কিনা, তাই দেখেই সে চললো। কিন্তু কোনো বাধা নেই, সামনের সুদীর্ঘ পথ অবারিত। গাড়ীখানা ছুটলো তীরবেগে।

অবশেষে সে কোনো এক বড় রাস্তার ধারে একটি বাড়ীর সামনে এসে গাড়ী থামিয়ে হর্ন বাজালো। সেই হর্ন শুনে উপরের বারান্দায় এক ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন। অজিন গাড়ী থেকে নেমে মুখ তুলে বললে, কে, সুধীর নাকি ?

জবাব এল, হ্যাঁ, তুমি এত রাত্রে ?

অজিন বললে, আমাদের বিমলাক্ষর স্মৃতিসভা ছিল, তুমি ত' জানো। আচ্ছা, প্রমীলা রায় কি তোমার এখানে আজ এসেছিলেন ?

সুধীর বললে হ্যাঁ, আজ সকাল থেকেই প্রমিলা ছিল আমাদের এখানে তোমাদের সভা থেকে ফিরে সে এই ঘণ্টা দুই আগে চলে গেছে।

কোথায় ?

খুব সম্ভব তার দিদির ওখানে। তুমি ত' জানো তার দিদির বাড়ী।

আচ্ছা ভাই, ধন্যবাদ।—বলে অজিন তাড়াতাড়ি এসে আবার গাড়ীতে উঠলো।

গাড়ী ছুটিয়ে সে চললো দক্ষিণ দিকে—যে পথ দিয়ে সে এসেছিল। আর কিছু নয়, শুধু এই কথাটা তার জানা দরকার—হঠাৎ সভা ছেড়ে সে চলে এলো কেন ? জানা দরকার, ইদানীং তার মনের গতি কোন্ দিকে।

যে-কথাটা সুধীরের কাছে জানা হোলো না, সেই কথাটাই তাকে শুনতে হবে—প্রমীলার গত বারো বছরের অজ্ঞাতবাসের হেতু কি!

মলিনা রায়ের বাড়ীর কাছে এসে সে গাড়ী থামালো। নেমে এসে দরজার কড়া নাড়লো। ভিতর থেকে একটি চাকর বেরিয়ে এসে দাঁড়াতেই অজিন বললেন, গোপেনবাবুকে একবার ডাকো ত'?

লোকটা বললে, তাঁরা ত' কেউ নেই?

নেই?

আজ্ঞে না, তাঁরা বিদেশে আছেন প্রায় চার মাস!

অজিন কিছুক্ষণ হতচকিত হয়ে রইলো। তারপর প্রশ্ন করলো, একজন মেয়েছেলে একটু আগে এখানে এসেছিলেন?

চাকরটা জবাব দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ—

কোথায় তিনি?

তিনি ঘরে এতক্ষণ বসেছিলেন, একটু আগে বেরিয়ে গেলেন। কেউ নেই কিনা বাড়ীতে!

কোন্ দিকে গেলেন?

তা জানিনে বাবু—ওই যে, ওই পথ দিয়ে গেলেন।

আচ্ছা—বলে অজিন তাড়াতাড়ি আবার গিয়ে গাড়ীতে উঠলো।

গাড়ীখানা সে ঘোরালো। ছুটিয়ে দিল সেই বিশেষ পথটায়। এত রাত্রে স্ত্রীলোকের চিহ্নও নেই কোনো পথে। ষ্টিয়ারিং ধরে এপাশে-ওপাশে দেখতে দেখতে অজিন চললো। এ যেন তার প্রতিজ্ঞা—এই অন্ধকার রাত্রেই প্রমীলার দেখা পাওয়া চাই। বেশী দূরে নয়, হয়তো আছে পাশেই, হয়তো খুব কাছেই—তাকে শুধু খুঁজে বার করা মাত্র। গাড়ীখানা ঘুরতে লাগলো এপথে, ওপথে, সে-পথে। শুধু ঘুরছে, যতক্ষণ ওর ঘোরবার

শক্তি থাকে। নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই, উদ্দেশ্যটাও অস্পষ্ট—শুধু উদ্‌ভ্রান্ত গাড়ীখানা অন্ধকার থেকে অন্ধকারে কিছু একটা খুঁজে বেড়াচ্ছে। দিনের বেলায় ঘটনা ঘটলে লোকে বলতো পাগলামি, হিসাবী ব্যক্তিরা বলতো মাতলামি, কিন্তু নিস্তব্ধ জনবিরল রাত্রির এই ছায়াচ্ছন্ন অস্পষ্ট অন্ধকারে এই খোঁজাখুঁজির মধ্যে একটি মানুষের অন্তরের সত্যের হয়তো কিছু আভাস পাওয়া যায়। অজিনের কোন ক্লান্তি নেই, তার উদ্বেগাকুল সেই চক্ষে কেমন একটা অদ্ভুত ক্ষুধা বিচ্ছুরিত হচ্ছিল—তার অর্থ তার নিজের কাছেও স্পষ্ট জানা নেই।

অবশেষে গাড়ীখানা হাঁসফাঁস করে কোন্ একটা পথের মাঝখানে এসে থামলো। গাড়ী আর চলবে না, পেট্রল ফুরিয়ে গেছে।

অজিন পরিশ্রান্ত, হায়রাণ! আর কোথায় সে খুঁজবে? হঠাৎ মনে হোলো কেনই-বা সে এতক্ষণ একটি নারীকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। খুঁজলে কি প্রমীলাকে পাওয়া যায়? বারো বছর ধরে খুঁজেও কি তাকে পাওয়া গিয়েছিল?

থাক্ আর নয়। এই গাড়ীখানার মধ্যে বসেই তাকে আজ রাত কাটাতে হবে, আর কোনো উপায় নেই। এতক্ষণ যেন একটা মস্ত ছেলে-মানুষী তাকে পেয়ে বসেছিল, এ যেন ঠিক ঝড়ের পিছনে ছোটা, স্বপ্নের দিকে হাত বাড়ানো।

প্রমীলা নিজেই এসেছিল, আবার একদিন নিজেই সে আসবে। এবার আসবে আলো হাতে নিয়ে, পথ দেখাবে, সন্দেহ ঘোচাবে। অজিনকে সেই দিন পর্যন্তই তপস্বীর মতো অপেক্ষা করতে হবে। জীবনটা অর্ধসত্য আর অস্পষ্টতায় যেন মোহগ্রস্ত—নির্ভুলভাবে কিছু জানা যাচ্ছে না। এই গোধূলির কালে সেই আলোটা যদি উদ্ভাসিত হয়, সেইটিই ত' একমাত্র কাম্য।

জুয়া

কানাকানিতে খবরটা অনেকদূর পর্যন্ত র'টে গিয়েছিল। শেষের দিকে এমন অবস্থায় এলো যে, কারো মুখেই হাত চাপা দেবার উপায় রইলো না।

দূর সম্পর্কের এক বৌদিদি ওকে সতর্ক ক'রে বলেছিলেন, না হয় মনের একটা বিকার ঘটেই গেছে, তাই ব'লে কি ওটাকে আঁকড়ে থাকতে হবে? এমন ত' আর কিছু নয় যে তুই বাঁধা পড়েছিস! মানুষ কত শোক-তাপ দুঃখ ভুলে যায়, ভাঙ্গা মন জোড়া দিয়ে কাজকর্মে লাগে, আর তুই এই সামান্য ব্যাপারটা সইয়ে নিতে পারবিনে?

ছোট মামী ব'লে গিয়েছিলেন, জন্মে অরুচি ধ'রে গেল! আকাশের চাঁদ ত' আর নয় যে, একটি বই দ্বিতীয় নেই! কি এমন রাজপুত্তুর আর আর্ধেক রাজত্ব পাবি যে, ধনুর্ভাঙ্গা পণ! গা জ্বলে যায়! কপালে তোর দুঃখ আছে!

পিসেমশাই সেবার কি যেন চাকরি নিয়ে দিল্লী যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, ছেলের পরিচয়টাও ত' ভালো নয় শুনছি। আগে নাকি জুয়া খেলতো। স্বভাব-চরিত্রটাও সম্ভবতঃ জুয়াড়ির সঙ্গে মেলানো!

বড়পিসি বললেন, চাল নেই চুলো নেই—ভাব ক'রে অমনি বিয়ে করলেই হোলো! ভাত কাপড় পাবি কোত্থেকে শুনি? দেশে বুঝি আর সৎপাত্র খুঁজে পেলিনে?

একজন টিটকারি দিয়ে বললে, সাবিত্রী চ'লেছেন কাঠুরিয়া সত্যবানের ঘরে।

বড়পিসি বললেন, তার পেছনে রাজা অশ্বপতি ছিলো গো! এ যে শুকনো চ্যালাকাঠ, এতটুকু রস নেই। শেষকালে কাঠ বেচেই পেট ভরাতে হবে।

সেদিন সকলের সব কথা আরতিকে মুখ বুজে শুনতে হয়েছিল। কেবল তাই নয়, ট্যুইশনি ক'রে তাকে কলেজের মাইনে জোগাতে হোতো —কিন্তু এই প্রকার কানাকানির ফলে তাকে ট্যুইশনিও ছাড়তে হোলো। কোনো কথাতেই সে আঘাত পেল না, এবং কোনো কথাই তা'র কাছে মূল্যহীন ব'লে মনে হোলো না। কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল এই যে, একটা দুশ্ছেদ্য অন্ধ আকর্ষণ তাকে টেনে নিয়ে চলেছিল একটা পরিণতির দিকে। তা'র ফিরবার পথ ছিল না। যাবার সময় তাকে কেবল এই কথাটা শুনে যেতে হয়েছিল, তোর মা বাপ মরেছিল ধান ভেনে,—তুই এসে পরের বাড়ীতে গাঁ-সম্পর্ক পাতিয়ে মানুষ হলি,—তোর লজ্জা নেই! ভাব ক'রে বিয়ে হয় বড় মানষের ঘরে,—গরীবের মেয়ের অত ঘোড়া-রোগ কেন?

বিদায় নেবার আগে আরতিকে এবাড়ীর সঙ্গে সকল সম্পর্ক মুছে যেতে হয়েছিল। তাতে বেদনাবোধ ছিল অনেক, কিন্তু অনুশোচনা ছিল না।

ভরা বর্ষার কোনো এক সকালের দিকে আরতি ট্রেণ থেকে নামলো সাঁওতাল পরগণার একটি ষ্টেশনে। সঙ্গে মীরাদির একখানা চিঠি ছিল। তিনি লিখেছিলেন, ষ্টেশনে নেমে পূর্বদিকে চওড়া রাস্তা ধ'রে কিছুদূর উত্তরে আসবি। টিলাপাহাড়ের ধার, পাশেই বালু নদী। নদী পেরোতে হবে না, আবার পূর্বদিকের পথ ধরবি নদীর ধার দিয়ে। আমাদের দোতলা বাড়ী মাঠের মাঝখানে একা দাঁড়িয়ে,—শাদা রং। বাড়ীর দক্ষিণে পুরনো শিব মন্দির।

শিবমন্দিরের পাশ দিয়ে আরতি বাড়ীর ভিতর এসে ঢুকলো। মীরাদিদি তাড়াতাড়ি নেমে এসে আরতির হাত ধ'রে বললেন, চোখে জল কেন রে?

স্নেহের স্পর্শে অনেকটা কান্নাই আরতির গলার ভিতর দিয়ে উঠে এসেছিল, কিন্তু সংযত কণ্ঠে বললে, না, কিছু না—তোমার ছেলে-মেয়ে ভালো আছে?

মীরাদি বললেন, অনেক ভুগিয়ে এখন একটু ভালো। আয় ভেতরে আয়। ওপরে দক্ষিণ দিকের ঘরে তুই থাকিস। আমি জানতুম আজই তুই আসবি।

কেমন ক'রে জানলে?

হাত গুণে!

আরতি হেসে বললে, হাত গুণতে জানো তুমি?

খুব জানি,—এই দেখনা!—মীরাদি আঙুল গুণে বললেন, বুধবারে আমার চিঠি পেয়েছিস। বেস্পতিবার সারাদিন ভেবেছিস আর পাঁচ-জনের খোঁটা খেয়েছিস। শুক্রবার রাত্তিরে গাড়ীতে উঠেছিস,—আজ হোলো শনিবার। কেমন, মেলেনি?

আরতি বললে, এবার হাত গুণে আমার ভবিষ্যৎটা বলো ত?

মীরাদি বললেন, তোর ভবিষ্যৎটাও শেকল দিয়ে বেঁধে রেখেছি। দেখগে যা ওপরে গিয়ে। আজ আটদিন হোলো বিছানায় প'ড়ে আছে।

কে? নবেন্দু?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ,—এবার যাও সেবা করগে। আরতি ভীতকণ্ঠে বললে, এ তুমি কী করলে মীরাদি? লোকে কি বলবে?

মীরাদি বললেন, লোকের মুখ চেয়ে কি তোমরা প্রণয়কাণ্ড ঘটিয়েছিলে?

কিন্তু নিজের কাছে মাথা হেঁট হবে যে।

কেন?

আমরা কি কোনদিন একবাড়ীতে থেকেছি ?

মীরাদি আরতির দিকে তাকালেন। আরতি কম্পিত কণ্ঠে বললে, আমাকে আজ বিকেলের গাড়ীতে ছেড়ে দাও, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, মীরাদি।

মীরাদি বললেন, যে-বিদ্যে নিয়ে বি-এ পড়েছিস, সে-বিদ্যে পালালো কোথায় ? নিজের ওপর বিশ্বাসের জোর নেই কেন ?

আরতি ভগ্নকণ্ঠে বললে, ওকে আমি ঘরের মধ্যে কোনদিন দেখিনি যে ! কোনোদিন দেখিনি বিছানায় শোয়া ! সেবা করবো কোন্ অধিকারে ?

যে-অধিকারে ওকে পুড়িয়ে মারছিস তিন বছর ধ'রে !

পু'ড়ে মরতে চাই, পুড়িয়ে মারতে চাইনে, মীরাদি।

ঝি এসে চায়ের সঙ্গে খাবার দিয়ে গেল। মীরাদি বললেন, চা খেয়ে ওপরে যাই চল্।

আরতি বললে, ও কি জানে আমি আসবো ?

জানে।

কিছু বলেছে ?

আমার ওপর রাগ করেছে।

কেন ?

যে-কারণে তুই এখন রাগ করলি ?

চায়ের পেয়ালা রেখে আরতি একাই ওপরে উঠে গেল। মীরাদি গেলেন রান্নাঘরের দিকে।

একখানা বই হাতে নিয়ে নবেন্দু তক্তার ওপর শুয়েছিল। পায়ের দিকে একখানা চাদর টানা ! আরতি আস্তে আস্তে ভিতরে এসে দাঁড়ালো।

বইখানা পাশে রেখে নবেন্দু বললে, সমস্তটাই মীরাদীর ষড়যন্ত্র। আমার দোষ কিছু নেই!

আরতি বললে, কলকাতা ছাড়বার আগে আমাকে জানাওনি কেন?

তোমাকে জানিয়ে কি কোন কাজ করি?

আরতি কিছুক্ষণ দাঁড়ালো। পরে বললে, জ্বর কি আছে এখনও?

থাকলেই বা।

এপ্রকার কথালাপ ওদের পক্ষে গা-সওয়া। উভয় পক্ষের উত্তর এবং প্রত্যুত্তরের মধ্যে কোনো সংযোগ না রেখেই আরতি এক সময় বললে, যে চাকরিটার চেষ্টা করছিলে, সেটার কি আশা আছে?

নবেন্দু বললে, আশা হয়ত আছে, কিন্তু তার ভরসায় বিয়ে করা চলে না। মীরাদি যতই বলুন।

আরতি বললে, আমি কি বলেছি যে, তুমি চাকরি করবে, আর আমি ব'সে থাকবো?

নবেন্দু বললে, কপালে সিঁন্দুর উঠলে মেয়েছেলের ওপর ভরসা কতটুকু?

আরতি বললে, তবে কি তুমি বলতে চাও, আমি দুদিক থেকেই এমনি ক'রে মার খেয়ে বেড়াবো?

তুমি সেই রাজসাহীর মেয়ে-ইস্কুলে গিয়ে মাষ্টারী করতে পারো!

আর তুমি?

আমি?—নবেন্দু ক্ষীণ হাসি হেসে বললে, আমি ভোজনং যত্র তত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে!

আরতি বললে, জ্বর কি একবারও ছাড়েনি ক'দিন?

না। ভূত না ছাড়লে জ্বর ছাড়ে না।

ভূত চেপেছে আমার ঘাড়ে তিন বছর। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারলে!

নবেন্দু বললে, আমার ঘাড়ে চেপেছে পেত্নী,—ছাড়বার কোনো লক্ষন দেখিনে!

তুমি বুঝি ছাড়াতে চাও?

একশো বার।

আরতি বললে, তোমার জন্যে আমি সব খুইয়ে এসেছি তা জানো?

নবেন্দু বললে, সংসারে তোমার একখানা ভাঙ্গা খুন্তিও নেই। সব খোয়াবার মানে কি?

দুধ-সাগুর বাটি হাতে নিয়ে নীরাদি ঘরে ঢুকলেন। বললেন, তোমাদের কপাল মন্দ। কলকাতার পথেঘাটে, আড়ালে-আবডালে লোকের চোখে ধুলো দিয়ে দুজনে ঘুরে বেড়াতে,—একটু নিরিবিলি দেখাশোনা হবার ঠাঁই মিলতো না। এখানকার মত এত সুবিধে পেয়েছ কোনোদিন?

নবেন্দু বললে, সেই জন্যেই ত' ভয় করে।

নীরাদি বললেন, লুকোচুরি করা বেশীদিন ভালো নয়, ওতে নোংরা জমে ওঠে। তার চেয়ে এই ঘরের মধ্যে ব'সে দুজনে মুখোমুখি তাকাও। যারা ধ'রে রাখতে পারে না, ছেড়েদিতেও চায় না—তা'রা কষ্ট পায়, নবেন্দু।

নবেন্দু বললে, আমার শেষ কথা কাল রাত্রে ত' আপনাকে জানিয়েছি, নীরাদি!

নীরাদি বললেন, মেয়েটা কেঁদে কেঁদে পথে ভেসে বেড়াবে, সেই কি তোমার পৌরুষ? তিন বছর আগে তোমার এই নীতিবোধ ছিল কোথায়, নবেন্দু?

আমরা ত' আজো কোনো অপরাধ করিনি !

তোমরা যে জন্তুজানোয়ার নও, সেকথা চেঁচিয়ে বলার দরকার নেই। মেয়ে মানুষের সামাজিক দায়িত্ব পুরুষের হাতে, একথা ভুলে মেলামেশা করেছিলে কেন ?—নাও, খেয়ে নাও ভাই। কই দেখি—জ্বর ত ছেড়েছে মনে হচ্ছে।

মীরাদি নবেন্দুর কপালে হাত দিয়ে পরীক্ষা করলেন। তারপর একবাটি সাগু খাইয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আরতি চুপ ক'রে জানালার ধারে দাঁড়িয়েছিল। তার দিকে তাকিয়ে নবেন্দু বললে, এসব কথায় তোমারও সায় আছে বোধ হয় ?

আরতি বললে, যতই দিন যাবে, ততই এসব কথা উঠবে।

নবেন্দু কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। পরে বললে, তুমি এখানে এসেই মাটি করলে। তোমার মতলব ভালো নয়।

মতলব তোমারই কি খুব ভালো ছিল ?

এর চেয়ে দুজনে দুদিকে চ'লে গেলেই ভালো হোতো। নবেন্দু ক্ষুব্ধভাবে মুখ ফিরিয়ে নিল।

আরতি বললে, তার চেয়ে ভালো দুজনের একজন যদি মারা যায়।

নবেন্দু বললে, তুমি কি আমার মৃত্যুকামনা করো ?

করি।

কেন, অপরাধ ?

তুমি থাকলে পাছে আর কেউ জ্ব'লে পুড়ে মরে, তাই জন্যে।

কিন্তু তুমি বাঁচলেও ত' সেই একই কথা !—শোনো, শুনে যাও।

আরতি মুখ ফিরিয়ে থমকে দাঁড়ালো। নবেন্দু বললে, কাছে এসো।

আরতির গা কেঁপে ওঠে। বলে, না।

আচ্ছা, আর এক গজ এগিয়ে এসো।

বলো না, শুনছি।—আরতি একটু এগিয়ে আসে।

নবেন্দু বললে, তোমার দাঁড়াবার জায়গা নেই জানি, আমারও নেই,—অথচ বিয়ের সখ দুজনের। আচ্ছা, তুমি ঘরকন্না করতে পারবে? মনে রেখো রীতিমতো ঘরকন্না।

ঘরকন্না আবার কি?

বিয়ের পর থেকে দুজনে ঘেঁটা আরম্ভ। অর্থাৎ ঘুঁটে-কয়লা, কুটনো-বাটনা, আলু-পটলের ফর্দ।

আরতি বললে, তোমার কথা শুনলে বিয়ের ওপর ঘেন্না ধরে।

নবেন্দু বললে, এবং বিয়ের পর থেকে নিজের ওপর ঘেন্না ধরবে। আগুনের আঁচে মনটা আঁউরে যাবে।

বিয়ে করতে চাই তোমার জন্তে, বিয়ের জন্তে নয়।—আরতি মুখ ফুটে বললে।

নবেন্দু বললে, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য কি জানো? বিয়ের নর্দমায় আমরা না মুখ থুবড়ে প'ড়ে মরি। বিয়ে দেয় বন্ধন, ভালোবাসা দেয় মুক্তি! তাছাড়া শোনো আর এক কথা। এ-বিয়ে সামাজিক হবে না, কেননা জাতিগত প্রভেদ। অর্থনৈতিক হবে না, কেননা দুজনেই গরীব। ফল হবে এই, একদল কুকুর আমাদের পিছু নেবে।

বাইরে মীরাদির গলার আওয়াজ পেয়ে আরতি পুনরায় স'রে দাঁড়ালো। মীরাদি ভিতরে গলা বাড়িয়ে বললেন, আর নয়। মেয়েটা রাত জেগে গাড়ীতে এসেছে। আরতি যা, স্নান ক'রে নে।

আরতি নতমুখে বেরিয়ে গেল।

এর পরে ওদের যা অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, তাই ঘটলো। মীরাদি মাঝখানে দাঁড়িয়ে থেকে যে কাজ করলেন, সেটাকে সামাজিক অথবা সাংস্কারিক কোনোটাই বলা চলে না—আচারগত ত' নয়ই।

পরদিন সন্ধ্যায় মীরাদি নিজের তোরঙ্গ থেকে একখানা পোষাকী শাড়ী আরতিকে পরিয়ে নিয়ে গেলেন শিবমন্দিরে, অসুস্থ নবেন্দু গেল সঙ্গে সঙ্গে। সেখানে গিয়ে ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে নবেন্দু নিজের হাতে প্রসাদী সিঁদুর নিয়ে আরতির সীঁথিমূলে পরিয়ে দিল। মীরাদি একবার শঙ্খধ্বনি করলেন এবং তাঁর ছেলেমেয়ে দুটি মিষ্টান্ন হাতে নিয়ে বাড়ী ফিরে এলো।

আত্মীয় বন্ধুজনের থেকে ওরা অনেক দূরে চ'লে গিয়েছিল। যারা ওদের অধোগতি দেখার জন্য উৎসুক ছিল, ওরা গেল তাদের নাগালের বাইরে। ঘরকন্নার চেয়ে ওদের কাছে বড় ছিল প্রণয়, ছিল অনেক দিনের অবরুদ্ধ রংয়ের বন্যা। ওরা জানতে দিলো না কারুকে ওদের অস্তিত্বের সংবাদ। মেদিনীপুর জেলার এক ছোট শহরে গিয়ে আরতি সত্যই নিল বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর কাজ এবং নবেন্দু নিল এক উকিলের মুহুরিগিরি। ষ্টেশন মাষ্টার মশাই ওদের বসবাসের একটা সুবিধা ক'রে দিলেন। দুজনে মিলে পঞ্চান্ন টাকা। এত টাকা দুজনে রোজগার করা যায়, ওরা ভাবতেও পারেনি। পল্লী অঞ্চলে খরচ কম, সুতরাং কিছু জমাতে লাগলো। কিন্তু বছর খানেক না যেতেই জানা গেল এখানকার ছোট হাকিম নাকি নবেন্দুর পিসতুতো দাদার মাসতুতো শালা। কুটুম্ব সম্বন্ধে নবেন্দুর যত ঘৃণা ছিল, নবেন্দুর সম্বন্ধে কুটুম্বমহলে ততখানি ঘৃণা ছিল না। ফলে তার জাতিদ্রোহী গান্ধর্ব বিবাহের পরিণতি দাঁড়ালো

এই যে, আরতিকে নিয়ে নবেন্দু একদিন মেদিনীপুর ত্যাগ করতে বাধ্য হোলো। এই ঘটনার অল্প দিনের মধ্যে আরতি একটি কন্যা প্রসব করে।

নবজাত কন্যাকে নিয়ে আরতি আর নবেন্দু কোন্ দিকে ভাগ্য-অন্বেষণে বেরিয়ে পড়লো, সে সংবাদ ওই দুইটি তরুণ-তরুণী ভিন্ন আর কারো জানা ছিলনা। অবশ্য মীরাদিদির কথা স্বতন্ত্র, কেননা এরও বছর দেড়েক পরে ঠিকানাকাটা একখানা চিঠি ঘুরতে ফিরতে তাঁর কাছে এসে পৌছয়। তা'তে জানা যায়, ২৪ পরগণার একান্তে কোনো এক চটকলের ধারে তারা দুজনে এক বস্তিতে বাসা নিয়েছে। দিন তাদের যাচ্ছে বড় কষ্টে। মীরাদিদি সেই চিঠি পড়ে একটুও ক্ষুব্ধ হননি, কেননা তাঁর কোনো অনুশোচনা ছিল না। সমাজনীতির গোড়ার কথাটা তাঁর জানা ছিল বৈকি। চিত্তদৌর্বল্য ও সঙ্কোচবৃত্তি তিনি বরদাস্ত করেন নি, দুজনকে তিনি মিলিয়ে দিয়েছেন। যদি ওদের শক্তি থাকে বাঁচবে; যদি না থাকে, তবে ঈশ্বর ওদের সহায় হোন্!

এর পরে মীরাদি লিখছেন তাঁর ডায়েরীতে—

"আরতির বিয়ের পরে বার তিনেক মাত্র আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কিন্তু প্রথম যখন ওর সঙ্গে দেখা হোলো, তখন ওর দুটি মেয়ে, একটি ছেলে। অনেকদিন আগেকার সেই পুরনো ঠিকানা নিয়ে আমি বস্তির মধ্যে ঢুকেছিলুম, কিন্তু সেই বস্তির বর্ণনা করতে গেলে মাথা হে'ট হয়ে আসে। দুটো লেখাপড়া জানা ছেলেমেয়ে কোথায় গিয়ে নামলো তাই দেখে অবাক হলুম। ওরা বই পড়েছে, কিন্তু জীবনের সঙ্গে যোগ নেই; ভালোবেসেছে, কিন্তু কল্যাণচিন্তা করেনি। ওদের হৃদয় ছিল, বুদ্ধি ছিল না। কল্পনা ছিল, সাধারণ জ্ঞান ছিল না।

দেখে এলুম ওদের দারিদ্র্য। তিনটে শিশু স্বল্পাহারে ধুঁকছে, যেন বিকলাঙ্গ বানর-শিশু। ঘরকন্না ওরা জানে না, জানলে দারিদ্র্যের মধ্যেও শ্রী থাকতো। এখানে ওখানে দু একটা ভাঙ্গা কলাইয়ের বাসন ছড়ানো, এদিকে ওদিকে নোংরা। একই চালায় একটি কোণ ভাড়া নিয়ে থাকে এক ভ্রষ্টা নারী। তাকে দেখে আমি আঁৎকে উঠেছিলুম। আরতি এসে আমার কাছে বসে বললে, ভালো আছি মীরাদি।

ভালো আছিস? নবেন্দু কি করে?

চটকলে কাজ নিয়েছে।

তুই কি করিস?

দেখতেই পাচ্ছ।

পাছে আঘাত পায়, এজন্য আলগোছে বললুম, জীবনটাকে অন্যভাবে গ'ড়ে তুলতে পারলিনে?

আরতি বললে, এই বা মন্দ কি? দুজনে যেখানে থাকি সেটাই কি স্বর্গ নয়?

আমাকে চিঠি লিখেছিলি কেন?

আরতি বললে, আমাদের বিয়ের প্রত্যেক বাৎসরিক তিথিতে তোমাকে মনে পড়ে। এবারে তাই লিখেছিলুম। তুমি এসে দেখলে খুশী হবে এই ছিল আশা।

তবে সুখেই আছিস বল্?

আমি দুঃখ পাচ্ছি, এই ভেবে কি তুমি কাঁদতে এসেছিলে?

আমি হাসলুম। বললুম, এটা অভিমানের কথা, আরতি। সন্ন্যাসীরা যখন যোগাসনে বসে, তখন তাদের পরণে হয়ত লেংটিও থাকে না। কিন্তু

তুই? একি তোর যোগাসন? একখানা আস্ত কাপড় প'রে এসে অতিথির মান রাখতে পারলিনে?

নবেন্দুর সঙ্গে আমার দেখা হোলো না। ঠিক বুঝতে পারিনে, দেখা হলে ধৈর্য রাখতে পারতুম কিনা। বোধ হয় পারতুম, কারণ নবেন্দু বলেছিল—এবিয়েতে কাজ নেই, মীরাদি। ভাঙ্গা মন একদিন হয়ত জোড়া লাগতে পারে, কিন্তু জীবনটা যদি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়, তবে তাকে নতুন করে জোড়া দেওয়া বড় কঠিন। তুমি আমার কাছ থেকে আরতিকে সরিয়ে দাও।

আমি বলেছিলুম, তবে কি তোমাদের এই ভালোবাসা মিথ্যে?

নবেন্দু হেসে উঠেছিল। বলেছিল, এ-যুগের যৌবন দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে, ফুলের গোছা তার কাছে আনলে ফুলের অপমৃত্যু। ভালোবাসা এযুগে স্থগিত থাকুক।"

ডায়েরীর পাতা উলটিয়ে মীরাদি আবার লিখেছেন, "ভোলবার চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু আরতি আমাকে ভুলতে দেয়নি। বছর দুই পরে বেলেঘাটার এক ঠিকানা থেকে সে আমাকে লিখেছিল, আগের চেয়ে এখন আরো ভালো আছি, তার কারণ আমার চারটি ছেলেমেয়ের মধ্যে সম্প্রতি মহামারীতে দুটি মারা গেছে। এখন খরচপত্র কিছু কমে গিয়ে কতকটা সুবিধা হয়েছে। তোমার সঙ্গে দেখা হলে কিছু নতুন অভিজ্ঞতার কথা শোনাতে পারতুম। আমি ভালো নেই—একথা ভেবে যেন তুমি মিথ্যে দুঃখ পেয়ো না।

বেলেঘাটার সেই বস্তির ঠিকানায় একদিন গিয়ে দাঁড়ালুম। নবেন্দু এগিয়ে এলো বটে, কিন্তু নবেন্দুকে আমি চিনতে পারলুম না। হেসে বললুম, প্রায় সাত বছর পরে দেখা, আমাকে চিনতে পারো, নবেন্দু?

নবেন্দু হাসিমুখে বললে, চিনতে যে পারতো, সে বেঁচে নেই!

বললুম, জীবনযুদ্ধে জয় হোলো, না পরাজয়?

নবেন্দু জবাব দিল, ঠিক বুঝতে পারলুম না। যন্ত্রের কোনো স্বকীয়তা নেই, যন্ত্রীর হাতে সে পুতুল। আমরা সেই যন্ত্র, আমাদের ধ্বংস হয়েও হয়ত যুদ্ধে জয় হয়!

বললুম, এটা অদৃষ্টবাদীর কথা, পুরুষের কথা নয়, নবেন্দু!

পুরুষ!—নবেন্দু হাসলো। বীরপুরুষরাও কি জুয়া খেলায় হারে না, মীরাদি?

এমন সময় আরতি ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে মীরাদির পাশে বসলো। মাথায় রুক্ষ চুলের জটা, কোটরগত দুই চোখ, মুখখানা ভেঙ্গে লম্বা হয়ে গেছে, দেহখানা কঙ্কালসার। আমি আরতিকে প্রায় আমার কোলের মধ্যে টেনে নিলুম। কিন্তু হঠাৎ তার আলগা পিঠের ওপর হাত বুলোতে গিয়ে চমকে উঠে বললুম, এ কি রে? দড়া দড়া ফুলেছে কেন?

নবেন্দু বললে, আমার দানবীয় উত্তেজনার চিহ্ন পড়েছে ওর পিঠে, মীরাদি।

আমি বললুম, চাবুক, না চ্যালাকাঠ?

উত্তেজনার সময়ে কোনটা ব্যবহার করেছিলুম, ঠিক মনে নেই।

বললুম, ঘটনাটা ঘটলো কখন?

নবেন্দু বললে, জানতুম রোজ সন্ধ্যেবেলা ওর জ্বর আসে, সেইজন্য ঘণ্টা চারেক আগে কাজটা সেরে রেখেছি।

এর স্থূল কারণটা কি, নবেন্দু?

প্রেতকায় নবেন্দু আবার হাসলো। বললে, খুব সহজসাধ্য ব্যাপার! জীবনযুদ্ধে মার খাওয়া, চিত্তপীড়া, দারিদ্র্য, আত্মগ্লানি, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভয়—আর কি শুনতে চান্ বলুন?

আরতির চোখের জল গড়িয়ে পড়ছিল আমার পাঁজরের কাছে। তাকে এবার একটু নাড়া দিয়ে প্রশ্ন করলুম, কি রে, তোর আত্মগ্লানি নেই? বল্ না?

আরতি জবাব দিল, না নেই!

হেসে বললুম, পিঠের চামড়া ফেটে গেল মার খেয়ে, তবুও নেই?

আরতি বললে, সহ্য করতে পারি, তাই মার খাই। দুর্বলকে ত' কেউ মারে না, মীরাদি?

নবেন্দু নতমুখে চ'লে গেল বাইরের দিকে। তার আর দাঁড়াবার সাধ্য ছিল না।

বললুম, আচ্ছা, আরতি—একটা কথা বল্‌ত, আমি কি তোদের দুজনকে নষ্ট করেছি?

আরতি বললে, না।

সত্যি বলছিস?

আরতি বললে, তুমি দুজনকে মিলিয়ে দিয়েছিলে। কিন্তু আমি কেবল তার থেকে একটা মানে খুঁজে পেয়েছি—যেটা আমার নিজের কাছে সত্যি।

বললুম, নবেন্দুর কাছে সত্যি নয়?

না। সত্যি নয় ব'লেই ও প্রতিবাদ করে, ছোবল মারে, আমার পিঠে দাগ টেনে দেয়!

আর তুই?

আমি মানে পাই, তাই আমার আনন্দ, তাই আমার কোনো দুঃখ নেই মনে। যার খেলে কান্না পায় না, কেবল ওই ওর দুঃখ সইতে পারিনে, মীরাদি।—আরতি ঝর ঝর ক'রে শেষ দিনের কান্না কাঁদলো আমার পিছন দিকে মুখ লুকিয়ে। কিন্তু আমার আর সেদিন বসবার সময় ছিল না। নিঃশব্দে উঠে অগ্রসর হলুম।

একটা ক্ষণিক আবেগ-বিহ্বলতা উঠে এসেছিল আমার কণ্ঠে। বললুম, তুই কি বলতে চাস তোদের এই মিলন সার্থক ?

আরতি স্পষ্ট ক'রে বললে, নিশ্চয়ই।

বললুম, আমি হার মেনেছি, কিন্তু তুই কি কিছুতেই হার মানবিনে ?

দেওয়াল ধ'রে ধ'রে রুগ্ন দেহ নিয়ে আরতি আমার দিকে এগিয়ে এলো। বললে, না, মানবো না। তুমি অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে আমাকে ঠেলে দিয়েছিলে, আমি খুঁজে পেয়েছি সোনার খনি, সেই আমার পরমার্থ !

আর কোনো কথা না ব'লে আমি পথে নামলুম। অন্ধকার বস্তির নোংরা অলিগলি পেরিয়ে গিয়ে গাড়ীতে উঠলুম। ভাবছিলুম, আমি আরতিকে হত্যা করেছি, এ কথাটা মিথ্যে। ও নিজেই নিজের মৃত্যুবীজ বহন ক'রে এনেছে।"

দারিদ্র্যটা কাটিয়ে উঠতে নবেন্দুর অবশ্য কয়েকটা বছর লেগেছিল এবং সেই দারিদ্র্য থেকে উত্তীর্ণ হবার জন্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মুদ্রাস্ফীতিরও দরকার হয়েছিল।

জরাজীর্ণ যে মন্দিরে দাঁড়িয়ে ঠাকুরের সামনে নবেন্দু একদা আরতির সীঁথিমূলে সিঁন্দুরের রেখা টেনে দেয়, সেই মন্দিরটিকে নবেন্দু পুনর্গঠন

করে এজন্য তা'র বহু টাকা খরচ হয়। নাটমন্দির, ফুলের বাগান, পূজারীর বাসস্থান, অতিথিশালা, ঠাকুরের দৈনিক ভোগের ব্যবস্থা,—কোনোটারই ত্রুটি ঘটলো না। আমদানি-রপ্তানির ব্যবসায়ে নবেন্দু নাকি ফুলে ফেঁপে উঠেছে!

নগরের রাজপথের উপর সে নাকি এক অট্টালিকা নির্মাণ করেছে। তারই গৃহ প্রবেশের উৎসবে আমন্ত্রণ জানিয়েছে মীরাদিকে। তাঁকে আমন্ত্রণ রক্ষা করতেই হবে।

একখানা নূতন মোটর গাড়ী এসে মীরাদিকে নিয়ে গেল। মীরাদি অকম্প, নিঃঝুম। আজকের আনন্দ-উৎসবে ওরা তাঁকে ভোলেনি। ওরা অন্ধকার থেকে আলোয় এসেছে, মৃত্যুর থেকে ফিরে এসেছে জীবনে। মাঝখানে কয়েকটা অভিশপ্ত বছর,—ওরা মূল্য দিয়েছে প্রচুর! সমস্ত ব্যাপারটা ভাগ্যের যাদুবিদ্যার মতো।

নবনির্মিত অট্টালিকার বিচিত্র দালান আর বারান্দা পেরিয়ে মীরাদি যখন শয়নকক্ষে এসে দাঁড়ালেন, তখন দেখা গেল, নবেন্দু বেহুঁস হয়ে প'ড়ে রয়েছে বিছানায়। পাশে তা'র নূতন বধূ ব'সে স্বামীর সেবা করছে। ঘরের হাওয়া ঘুলিয়ে রয়েছে সুরার গন্ধে।

নূতন বধূ উঠে এসে আস্তে আস্তে বললে, উনি যেন কি খেয়ে আসেন বাইরের থেকে······তারপর, এই ত!—আপনি বসুন?

মীরাদি বললেন, দেওয়ালে ফুল দিয়ে সাজানো ছবিখানা কা'র?

বধূ বললেন, ওঁর আগেকার স্ত্রীর!

ছেলেমেয়ে দুটি?

তা'রা কনভেন্টে থাকে।

মীরাদি বললেন,"আমি আর একদিন আসবো, নবেন্দুকে ব'লে রেখো ভাই।—

মীরাদিদি মুখ ফিরিয়ে বাইরের দিকে অগ্রসর হলেন এবং পিছন থেকে এক জোড়া চোখ তাঁকে অনেক দূর পর্যন্ত অনুসরণ করতে লাগলো। সেই চোখ নববধূর নয়, সে-চোখ দেওয়ালের ছবির থেকে নেমে যেন তাঁর পিছু নিয়েছিল।

ভারবাহী

সকাল থেকে নিশ্বাস ফেলবার সময় কোথায়? গরুর ঘরের কাজ শেষ না হতেই ভোর ছ'টা বেজে যায়। আর যুমুনিকেও বলিহারি, ও যেন শশধরকে এরই মধ্যে চিনে রেখেছে! গরু পুষবার সখ আগে ছিল না, কিন্তু দুধের সের এখন এক টাকা,—ছেলেমেয়েরা খায় কি? কথাটা কিন্তু তা নয়,—আসলে শশধর সেদিন ষ্টেশনে নেমেই দেখলো, খান দুই পুরণো করোগেটের টিন বিক্রি হচ্ছে আড়াই টাকায়। অমনি তার মাথায় একটা ফন্দী আঁটলো। নিজেই অনেক কষ্টে টিন দুখানা কাঁধে করে বাড়ী ফিরলো। অনু বেরিয়ে এসে একগাল হেসে বললে, তোমার কি সবই অদ্ভুত? টিন কি হবে?

শশধর জবাব দিয়েছিল, গরু!

গরু? ও মা, গরু কি গো?

বলছি, আগে এক পেয়ালা চা দাও দেখি?

ওই টিন দু'খানা শশধর নিজের হাতেই পরদিন ছাইলো। সে যেমন ভালো রাঁধতে জানে, মিস্ত্রি-ঘরামির কাজও তেমন কম জানে না। ঝড়ে না ওড়ে, বর্ষায় না জল চোঁয়ায়, গরমে গরু না কষ্ট পায়, আবার শীতের দিনে গরুর গায়ে মধুর রোদটুকু লাগে,—এসব দিকে তার বেশ নজর ছিল। আট দিনের দিন,—সে যেমন সব অসাধ্য সাধন করে—হঠাৎ এক গরু আর বাছুর এনে সে হাজির করলো। অনু ত' অবাক। বললে, আচ্ছা বেশ, তুমি ত অনেক করেছ, আজ থেকে আমি ওর জাব মেখে দেবো।

তুমি মাখবে? তবেই হয়েছে! কোলের ছেলেটা হবার পর থেকে না তোমার হার্টের ব্যামো? তুমি মাখবে গরুর জাব? কোমর ব্যথা আরো বাড়াবে, কেমন?—শশধর নিজের কাজে মন দেয়

অনু যাবার সময় মিষ্টি অভিযোগ জানিয়ে বলে গেল, আমাকে কেবল পটের বিবি বানিয়ে রাখবে, এই বুঝি চাও ?

নতুন লাউ ডগার জন্য মাচান বাঁধতে বাঁধতে শশধর গলা বাড়িয়ে বলে, এখন সাতটা বেজে পনেরো, আমার সময় নেই। ছাগল দুটো গেল কোথায় ? দেখো, বেড়া ডিঙিয়ে যেন আসে না এদিকে। বুলুকে জামা পরিয়ে দাও, এখুনি যাবো ওকে নিয়ে ডাক্তারখানায়।—এই, এই,—পড়বি, পড়বি। ওগো, ধরো একটু হাবলুকে।

মাচানের কাজ সেরে কুয়োতলায় গিয়ে ময়লা জামাকাপড়গুলো একখানে রাখে। তারপর ছেঁড়া শার্টটা কোনোমতে গায়ে চড়িয়ে বুলুকে কাঁধে নিয়ে শশধর বেরিয়ে যায়।

ফিরে আসে আধঘণ্টার মধ্যেই। তারপর তাকে এক দাগ ওষুধ আর একটু মিষ্টি লেবুর রস খাইয়ে শশধর যায় রান্নাঘরে। বলে, অত তাড়াতাড়ি বঁটির ওপর হাত চালিয়ো না, অনু। আলুর খোসা নাই বা ছাড়ালে, ওতে ভিটামিন্ নষ্ট হয়।

হয়েছে বাপু, থামো। ডালটা আগে সাঁতলাই।

শশধর তাড়াতাড়ি শিল নোড়া টেনে বাটনা বাটতে বসে যায়। মসলাপাতি থাকে কোথায়, এ খবর তা'র জানা আছে। একটু লঙ্কা, একটু হলুদ,—মিনুর পেটের ব্যামো, তা'র কচি মাছের ঝোলের জন্য একটু জিরা-মরিচ বাটা। পাতিলেবু মেখে দিয়ো ওর ঝোলভাতে, কাল আপিস থেকে ফেরার পথে নেবু-যে কিনে এনেছি। ছ'পয়সা এক জোড়া পাতিনেবু। কী দর আজকাল !

বাটনা বাটা সেরে হাত ধুয়ে শশধর যায় ঘরে। অমুর অঙ্কের খাতা নেই, একখানা পাতলা খাতা শশধর তাড়াতাড়ি শেলাই করে দেয়।—

আচ্ছা, আচ্ছা, আজ একটা পেন্সিল এনে দেবো আফিস থেকে ফেরার পথে। ওই, আবার ওকে মারলি কেন, বুজি? দে না একখানা বিস্কুট ওর হাতে? বিস্কুটের পাউণ্ড ন'সিকে, ওগুলো খেলে পেট খারাপ হয় না। বুজি, মনে রাখিস, হাঁস ক'টা আজ খেতে পায়নি। একমুঠো ধান ওদের ভিজিয়ে দিস।

ছেলেমেয়েরা হাট বাধিয়েছে বাইরে গিয়ে। অমু কেন ওদের পুতুলের কাপড় চুরি করে? মাতুর কলমটা বুঝি হারালো? ওই নাও, কলমটার দাম নিয়েছিল তিন টাকা। ওগো, শিগগির এসো, তোমার আদুরি কাঁথা নষ্ট করে ফেলেছে। এবার যাই, আটটা দশ।

শশধর ঘড়ি দেখে বাইরে চলে যায়। এক নম্বরের মোটে সাবানখানা হাতে নিয়ে সে কুয়োতলায় গিয়ে বসে। ছেলেমেয়েদের ফ্রক, পেনি, গেঞ্জি, তোয়ালে, কাঁথা, বালিশের ওয়াড, নিজের পরণের ধুতিখানা, অমুর গায়ের জামা,—সবগুলো একসঙ্গে নিয়ে সাবান দিতে বসে। ওতেই যায় প্রায় পনেরো মিনিট। এক সময় গলা বাড়িয়ে বলে, ঘড়িটা একবার ভাখ ত' মাতু? আর দেখে কি হবে, আমারই আন্দাজ আছে!—হ্যাঁগো, এগুলো শুকোতে দিয়ে যাচ্ছি, ফিরে এসে আমি ইস্তিরি করে দেবো, বুঝলে?

অমু ওধার থেকে হেসে জবাব দেয়, আমাকে আর লজ্জা দিও না। মাথায় জল দিয়ে এবার এসে দুটি খেয়ে নাও দিকি?

ছেলেমেয়ে ক'টার দিকে ফিরে তাকাবারও সময় হয় না। ভোর বেলা গোয়ালে ঢোকবার আগেই ওদের একটু বেড়িয়ে আনতে হয়। দোয়াল এলে তবে দুধ। দুধের জন্যেই অমুকে আটকে থাকতে হয়, নৈলে সেও একটু বেড়িয়ে আসতে পারতো। অমুর বিশ্রামের দরকার, খুব দরকার। তিন বছরের মধ্যে পর পর দুটি সন্তান মারা গেছে, অমু সে-ধাক্কা

আজও সামলে উঠতে পারেনি। শেষেরটি হয়েছে এই গেল ফাল্গুন মাসে। তার আগেরটি—ওই যে বুলু—ও হয়েছে গেল বছর পুজোর সময়। সেই যে দুর্গাসপ্তমীর রাত্রি—কী ঝড় বৃষ্টি সেদিন! আধেক রাত্রে শশধর দাইয়ের বাড়ীতে ছুটলো—কিন্তু সর্বনাশ, দাই মাগির হয়েছিল রক্ত আমাশয়। অবশেষে, ভাবতে গেলে এখনও গা কেঁপে ওঠে,—শশধরকে নিজের হাতেই সব করতে হোলো! কী ভাগ্যি যে, অনু কোনো কষ্ট পায়নি সেই রাত্রে,—শশধরের পরিশ্রম তাই সার্থক হয়েছিল। আপিস থেকে সেবার একটি দিনও ছুটি নিতে হয়নি। শশধর নিজের হাতেই সেবার অনুর আঁতুড় তুলেছিল। সেবছর শশধরের খামারে পর পর আটটা কুমড়ো ফলেছিল। ম্যালেরিয়া জ্বরে ধরলো খাতুকে ঠিক সেই অঘ্রাণ মাসে। শশধর রোজ সকালে উঠে তাকে আনাজ সিদ্ধ করে দিত, আর তার জন্যে টাট্‌কা গরুর দুধ দুইয়ে আনতো গয়লাপাড়া থেকে! ডাক্তার বদ্যিতে অত বিশ্বাস তার নেই। ভালো খাওয়াতে পারলে তবেই ত' বাচ্চারা ভালো ক'রে মানুষ হয়ে ওঠে! সেই থেকে শশধর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো, যেমন করেই হোক, গরু তাকে পুষতেই হবে। অন্তত সের পাঁচেক দুধ হলে তার বেশ চলে যাবে।

স্নান করে এসে শশধর খেতে বসে। অতি যত্নে পরিপাটির সঙ্গে অনু ভাতের থালাটি স্বামীর মুখের সামনে ধরে দেয়। ছোট ছেলেটা গুটি গুটি এসে বাপের পাশে বসে।

খেতে বসে শশধর বলে, সাগু আর মিছরি আসবার সময় আনবো, তুমি কিন্তু একটু সরবৎ খেয়ো। উচ্ছে সেদ্ধ দিয়ো মিনুকে, আর শেষ পাতে কচি আমের ঝোল।—কুকুরটা গেল কোথায়, বলো ত? সকাল থেকে দেখিনি?

অনু অভিযোগ জানিয়ে বলে, অত অন্য দিকে মন থাকলে খাওয়া হয় না, তা জানো?

শশধর হাসে।—বলে, পেটে খিদে থাকলে ঠিক খাওয়া হয়! —দাও ত' হাবলুকে একটু আলু সেদ্ধ? আর শোনো, বেলা বারোটা নাগাত বাছুরটাকে বেঁধে দিয়ো। দেখো, ঘুম্‌নি যেন গুঁতিয়ে দেয় না। আমি ছাড়া কেউ গেলেই ও রাগ করে। ওকে খুদ সেদ্ধ দিয়ো বেলা বারোটায়, তার সঙ্গে এক খাবলা নুন। আমি ফেরবার সময় ছোলার ভূষি আর খোল কিনে আনবো। কী যে দর হয়েছে সব জিনিসের!

শশধর তার আহার সেরে যখন ওঠে, তখন ন'টা বাজতে পাঁচ! বলে, আর সময় নেই। সব কথা কি মনে থাকে? দাঁড়াও, ফর্দ করে নিই।

হাত মুখ ধুয়ে সে তাড়াতাড়ি ভিজে কাপড়গুলো রোদ্দুরে দিয়ে আসে। নিজের ফাউন্টেন পেন-এ কালি ভরে নেয়। হাতঘড়িতে দম দেয়। তারপর ছোট মেয়েটাকে এক দাগ ওষুধ ঢেলে খাওয়ায়।

অনু ধুতি আর জামাটা এগিয়ে দেয়, জুতো জোড়াটা পায়ের কাছে এনে রাখে। শশধর একটির পর একটি ফর্দ টুকে নেয়।—খোল্, ভূষি সাগু, মিছরি, অনুর মাথার তেল, নিমের দাঁতন, গোটা তিনেক হোমিও-প্যাথী ওষুধ, এক দিস্তে কাগজ,—এই ক'টা জিনিস অন্তত আজকে না আনলেই চলবে না। বিস্কুট ফুরিয়েছে, মাথার চিরুণী ভেঙে গেছে, গায়ে-মাখা সাবান একখানিও নেই, কিছু ডাল আর মসলা, ছোট মেয়েটার জন্য দু'গজ ফ্রগের কাপড়—ওগুলো না হয় আগামীকাল আনলেই চলবে। বড্ড দাম আজকাল জিনিসপত্রের, যত দেরীতে যত কম জিনিস কেনা যায় ততই ভালো।

ফর্দ শেষ করে শশধর কাপড় জামা পরে নেয়। তারপর ঘড়ির দিকে একবারটি তাকিয়ে একটু হাসে। এখনও হাতে প্রায় পনেরো মিনিট সময় আছে। ন'টা পঁচিশের লোক্যাল,—স্টেশন পর্যন্ত যেতে মিনিট সাতেক।

বিছানায় গা এলিয়ে শশধর একটা সিগারেট ধরায়। একটা সিগারেট শেষ হ'তে প্রায় দশ মিনিট লাগে।

অনু বলে, সকাল থেকে উড়োজাহাজ উড়িয়েছ। এতটুকু বিশ্রাম নেই, এমন করলে শরীর কদিন টিঁকবে?

শশধর তার দিকে তাকিয়ে বললে, হাতে ফোস্কা পড়লো কেমন করে?

ও কিছু না, গরম তেলের ছিটে।—বলি, আমার কথার জবাব দিচ্ছ না যে?

শশধর বলে, তুমি এক পাগল দেখি। বিশ্রাম নেবার সময় কোথায়?

তোমার শরীর ভাঙ্গলে ছেলেমেয়েদের দেখবে কে?

আমার শরীর ত ভাঙ্গে না! ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ ভাবতে হবে ত? এবার ত' ওদের পড়াশুনো নিয়ে ভাবতে হবে!

অনু বললে, তুমি পড়াবে কখন?

শশধর বললে, যে-কাজ করে, সে কাজের ফাঁকও জানে। সেই ফাঁকেই ওদের মাষ্টারী করবো?—আর এই ত্যাখোনা, কত খরচ কমিয়েছি। আসছে মাসের সাত তারিখে বীমার প্রিমিয়ম্ দিতে হবে। এমাসে একেবারে হাতখালি। মাইনে পেলেই তোমার জন্যে কাপড় আনতে হবে—

আমার কাপড় এখন চাইনে। আগে তোমার দুটো জামা করাও দিকি?

আমার জামা? পাগল আর কি! আমার জামা হবে সেই পূজোর সময়।—যাই, এবার উঠি।—শশধর তড়াং করে উঠে দাঁড়ায়।—পরে বলে, মাতু, মিনু, তোমরা যেন ভাইবোনদের সঙ্গে মারামারি করো না। দুপুর-বেলা একটু ঘুমিয়ো, বড্ড রোদ্দুর।

তারপর তাড়াতাড়ি আলমারিটা খুলে ওষুধের একটা টিউব শশধর বার করে। টিউবটা টিপে আঙ্গুলে একটু ওষুধ নিয়ে অনুর হাতের ফোস্কায় অতি যত্নে লাগিয়ে দেয়। বলে, গরম তেলে ট্যাংরা মাছ ছেড়ে একটু সরে যেতে হয়, বুঝলে?—আমি ফিরবো ছ'টা দশে,—আর নয়ত সাতটা পাঁচে।

জুতো পায়ে দিয়ে শশধর বেরিয়ে পড়ে। একবার পিছনে ফিরে বলে, কাপড়চোপড়গুলো বাইরে রইলো। বাছুরটাকে বেঁধো। তিনটের সময় ওষুধ দিয়ো মেয়েটাকে। আসবার সময় চা কিনে আনবো। পিছনের দরজাটা যেন খুলো না সারাদিনে।

বলতে বলতে হন্ হন্ করে শশধর ষ্টেশনের পথে চলে যায়। অনু আস্তে আস্তে জানালার কাছ থেকে সরে আসে। আজ তেরো বছরের মধ্যে শশধর একটি দিনের জন্যও বিশ্রাম নেয়নি!

আপিসের টিফিনের ছুটি বেলা দেড়টায়। শশধর চট্ করে বেরিয়ে চলে যায় লালদীঘির কোনে। বিস্কুট কেনে, লজেঞ্চুস কেনে। রুমাল কেনে পাচ আনায়,—মশারী টাঙ্গাবার দড়ি কেনে সস্তায়। সেখান থেকে অপর ফুটপাথে গিয়ে কেনে শুকনো গোটা দুই ফলমূল। ওতেই চলে যায় প্রায় আধঘণ্টা। তারপর ছুটতে ছুটতে আবার আপিসে ফিরে নিজের

টেবলে বসে। বসে বসেই হাঁপায় এবং হাঁপাতে হাঁপাতেই বেলা পাঁচটা অবধি মন দিয়ে কাজ করে। কাজে তার কোনোদিনই ভুল হয় না।

ঠিক পাঁচটা বেজে এক মিনিটের সময় সে উঠে পড়ে। এর ব্যতিক্রম নেই কোনোদিন। ঘড়ির কাঁটায় আসা, কাঁটা ধরে চলে যাওয়া। চাকরি করছে সে আজ প্রায় সতেরো বছর। কোনোদিন তার কামাই নেই। দশটা বেজে উনত্রিশ মিনিটে সে এসে টেবলে বসবেই। কাজ করে সে একমনে, কাজটা প্রধানত অঙ্কের। ঘড়িটা তার টেবলের সামনে থাকে,—ফাঁকি দেয় না এক মিনিট। একই জামা, একই জুতো এবং কলমটাও সেই একই।

সাতটা পাঁচের গাড়ী ধ'রে সে বাড়ী এসে পৌছলো সাড়ে সাতটায়। শেষের তিনটি শিশু এই সবেমাত্র ঘুমিয়েছে। ভারবাহী পশু যেমন এসে পিঠের থেকে বোঝা নামায়, তেমনি ক'রে শশধর জিনিসপত্রগুলো নামালো। সকালের ফর্দ সে মিলিয়ে নেয়, এবং ফর্দের অতিরিক্ত দু' একটি সামগ্রী আজ বেশী এসেছে। হাত পা ধুয়ে চা খেয়ে মাতুকে এখুনি পড়া ব'লে দিতে হবে। তারপরে ঘরের কাজ আছে। রাত্রে ধোবার হিসেব। মুদি আর কয়লার বিল। এখানকার কলুবাড়ী থেকে সরষের তেল তৈরী ক'রে আনতে হবে। আসছে কাল গম ভাঙ্গিয়ে আটা। কাল সকালে এক সময়ে থপ ক'রে বাজারটা এনে দিতে হবে। কাল শনিবার, কুকুরের জন্য মাংসের ছাঁট চাই, প্রত্যেক রবিবারে ওর জন্য দই বরাদ্দ

মাতুর পড়া ব'লে দেবার সঙ্গে সঙ্গে সকালের খবরের কাগজখানার ওপরেও চোখ বোলানো হয়ে যায়। এক সময় শশধর প্রশ্ন করে ওষুধ পড়েছিল ঠিক সময়ে ?

অনু বলে, হ্যাঁ।

শশধর বলে, তুমি কি ভাবছো বলো ত?

না, কিছু না।—অনু আস্তে আস্তে উঠে চলে যায়।

মাতু বলে, বাবা, হাবলু সারাদিন মাকে কোনো কাজ করতে দেয়নি। এমন দুষ্টুমি করছিল!

শশধর বলে, রান্না হয়নি বুঝি এখনো?

এইবার হবে। তুমি না থাকলে কিছু হবার জো নেই।

শশধর স্নেহের হাসি হাসে। বলে, কেমন ক'রে হবে? তোর মার যে শরীর খারাপ। অত কাজ পেরে উঠবে কেন?

শশধর উঠে রান্না ঘরে আসে। অনু তখন ভাত নামিয়ে ফ্যান গালতে বসেছে। শশধর পিছন থেকে বলে, গত মাসে ঠিক এই সময় তোমার জ্বর হয়েছিল অনু, মনে আছে?

অনু বলে, তাই ব'লে এ মাসেও বুঝি জ্বর হবে?

আগুনের তাপ লাগলে জ্বর হবেই ত! কাল শনিবার অমাবস্যা, মনে রেখো।

তাই বলে তোমাকে আর রান্নাঘরে ঢুকতে হবে না। তুমি ছাদে গিয়ে একটু ঠাণ্ডা হয়ে বসো দিকি?

শশধর হেসে উঠলো। বললে, আমি ঠাণ্ডা হবো ছাদে গিয়ে, আর তুমি থাকবে রান্নাঘরে আগুন তাতে! মেয়ে হয়েছ বলেই বুঝি এই শাস্তি?

শশধর এবার বেশ গুছিয়ে রাঁধতে বসে। বসবার আগে চট ক'রে গিয়ে সে কূয়ো থেকে দু' বালতি জল তুলে আনে। অনু অভিযোগ জানিয়ে বলে, তুমি বাড়ী এলেই আমার কোনো কাজে আর হাত আসে না!

শশধর কৌতুক কটাক্ষ ক'রে বলে, তোমাকে লুকিয়ে এর মধ্যে কি কাজ করেছি, তুমি এখনও কিছুই টের পাওনি।

কি বলো ত?

তবে শোনো। খামারের ধারে ধারে শাক আর আনাজের বীজ লাগিয়েছি এর মধ্যে। ঝিঙ্গে, উচ্ছে, পুঁই, কুমড়ো, লঙ্কা, শশা, কাঁকুড়, কুলিবেগুন—সব লাগিয়েছি। কথাটা হোলো এই, দৈনিক খরচটা বাঁচানো চাই। এর পরে আলু দেবো। ঘরে রইলো দুধ আর ডিম, আর বাইরে শাকসব্জি। এ ছাড়া সজনে, কলা, সুপুরি—এগুলো ত' হবেই।

গল্প করতে করতেই শশধর গোটা দুই তরকারী তৈরী ক'রে ফেলে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলে, তুমি ঝোলটা নামিয়ো, আমি চট ক'রে ,আসছি কলুবাড়ী থেকে।

কলুবাড়ী থেকে তেল নিয়ে ফিরলো সে আধ ঘণ্টা পরে। তারপর তিনটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে খাওয়াতে বসলো। তার কাজের জীবন, কাজকে সে ভালোবাসে। রাত্রে তাকে ভাবতে হবে ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ। মাতু আর মিনুর বিয়ে হবে আগে, তার জন্য সঞ্চয় চাই। আজ যদি হঠাৎ সে চোখ বোজে, অন্য ছেলেমেয়েদের হাত ধ'রে দাঁড়াবে কোথায়? অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে অন্ধকারে তাকিয়ে শশধর শিউরে উঠে। পর পর দুটি সন্তান মারা গেছে, এখন উপস্থিত তার ছয়টি ছেলেমেয়ে। ইতিমধ্যে এক একজনের নামে সে ব্যাঙ্কে খাতা খুলে রেখেছে। মাসে দশ টাকা রাখলে, বারো দশে একশো কুড়ি। দশ বছরে বারো শো টাকা। কিন্তু তিনটি ছেলে তার। অত টাকা তার রোজগার নেই। সুতরাং সকাল অথবা সন্ধ্যায় যখনই হোক, তাকে অন্য একটা কাজ ধরতেই হবে। জীবন ধারণেই খরচ ক্রমেই বেড়ে চলেছে, এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলা চাই।

টাকার দরকার পদে পদে। প্রচুর ব্যয় না করলে বাঁচা কঠিন, সেজন্য প্রচুর আয় করতে হবে। এই পাপচক্র থেকে আজকে আর কারো মুক্তি নেই। প্রতি মুহূর্তে ছুটতে হবে, আবর্তিত হতে হবে,—প্রতি মুহূর্তে সংগ্রহ করতে হবে। উপস্থিত কালের সমস্যা, ভবিষ্যৎকালের আশঙ্কা,—এ ছাড়া আর কিছু ভাববার নেই। তাকে গড়ে তুলতে হবে ভবিষ্যৎ, গড়ে তুলতে হবে পারিবারিক নিরাপত্তা,—তাকে মৃত্যুর আগে জেনে যেতে হবে এদের ভবিষ্যৎ সংস্থানের কথা।

শশধর আতঙ্কিত চক্ষে অন্ধকারে তাকিয়ে থাকে। ছেলেমেয়েদের কথা মনে ক'রে তার যেন বুকের মধ্যে গুর গুর করে, অনুর কথা ভাবতে গেলে তার যেন কান্না আসে। যেমন করেই হোক, আগামী মাস থেকে তাকে অপর কোনো উপায়ে আর একটা উপার্জনের পথ স্থির করতে হবে। সম্মানের ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে রাখতে হবে এই কয়টি নিরুপায় সন্তানকে। সে চোখ বুজলে অনুকে যেন এদের হাত ধরে পথে না দাঁড়াতে হয়।

শেলাইয়ের কাজ শশধর ভালোই জানে। ছোটবেলা সে তার বড়দিদির কাছে এ কাজটা শিখেছিল। দিন কয়েকের মধ্যে শশধর অনেক প্রকার কলাকৌশল করে শেলাইয়ের এক মেসিন এনে হাজির করলো। শেলাইয়ের কাজ অনুও জানে,—মাতুকেও শেখাতে পারবে। সুতো কাটতে শশধর জানতো, এমন কি কাঠি ধরে মাছধরা জালও সে বুনতে পারতো। শশধর স্থির করলো, সে একটা ছোট পাঠশালা এখানে বসাবে এবং সকালের দিকে ঘণ্টাখানেক সে পড়াবে। ত্রিশটি ছাত্র যদি হয় তবে মাথা পিছু দু'টাকা,—মাসে ষাট টাকা। ওই সঙ্গে বানিয়ে নেবে আর একটা গোয়াল ঘর যেমন করেই হোক—। গোটা পাঁচেক গরু যদি থাকে তবে দৈনিক

প্রায় আধ মণ দুধ। অর্থাৎ নিজের দুধটা রেখে দৈনিক প্রায় পনেরো টাকা আয়। পাঁচটা গরুর খরচ দশ টাকা প্রতিদিন,—তবু মাসে থাকে একশো থেকে দেড়শো টাকা। বড় জোর না হয় একটা চাকর সে রেখে দেবে। ওই খালি জায়গাটুকুতে সে বসাবে ফুলের গাছ,—হক সাহেবের বাজারে এক একটি গোলাপের দাম চার আনা ত' বটেই। এক পাল হাঁস যদি থাকে তার এখানে, তবে তার থেকেও মাসে পনেরো টাকা আয়। টাকা চারিদিকে ছড়ানো, কেবল কুড়িয়ে নিতে জানা চাই। কাঠের ছাঁচ কিনে এনে তারা মাটির পুতুল গড়ে তুলতে পারে,—রং ধরিয়ে নিয়ে গেলে বাজারে পড়তে পায় না। শশধর সাবান তৈরী করতে জানে,—জানে কাগজের অনেক খেলনা বানাতে। সে সঙ্গীতের চর্চা করেছে অনেকদিন। প্রতি শনিবার ও রবিবারে সে যদি কোথাও গান শেখায় তবে সেখান থেকেও পায় অন্তত গোটা পঁচিশেক টাকা। সন্দেশ তৈরীতে তার একদিন হাতযশ ছিল,—মাঝে মাঝে সে যদি সন্দেশ তৈরী ক'রে নিয়ে আপিসে দেয়, তবে কেরাণীবাবুরা কিনে নেয় অতি আনন্দে—তাতেও কিছু লাভ! সুগন্ধী মাথার তেলের ফরমুলা তার জানা আছে, ভালো তেল বানিয়ে লেবেল্ লাগিয়ে ছাড়তে পারলে প্রচুর টাকা। যদি হঠাৎ তার চাকরী যায়, তবে তাকে নানা কাজে ডুবে থাকতে হবে, সংসার ত' চালানো চাই।

নিজের কায়িক শক্তির কথা যখন শশধর ভাবতে বসে, তখন সে প্রচুর জোর পায়; সে যেন স্ফীত হয়ে উঠে। যখন সংশয় জাগে, তখন আত্ম-প্রত্যয়ের ভিত্তিমূল কাঁপতে থাকে, সে দিশাহারা হয়। তার ধারণা, তার চারিপাশের সকল মানুষই দুর্বল, অসহায়, ভাগ্যের ক্রীড়নক। সে একা শক্তিমান, স্বপ্রতিষ্ঠ, আত্মবিশ্বাসী। সে জীবিত আছে বলেই সংসার

আছে, সৃষ্টি আছে, স্ত্রীপুত্র-পরিবার নিরাপদে আছে। সে কেবল বিশ্বাস করে নিজেকে, নিজের অস্তিত্বকে। সে যেদিন থাকবে না, সেদিন সবটাই ঘোর অন্ধকার। সে-অন্ধকারে আলো নেই, আশা নেই, আশ্বাস নেই, আনন্দ নেই। সেখানে চিররাত্রির ভয়াবহতা।

শশধর একদিন আপিস থেকে ফিরলো দুটো রাঙা চোখ নিয়ে। দুই হাতে দুটো থলে, সে দুটোর মধ্যে নানাবিধ জিনিসপত্র ও খাদ্য সামগ্রী। থলে দুটো নামিয়ে সে শ্রান্তভাবে এক জায়গায় বসে পড়লো। এলোমেলো মাথার চুল, কপালের শিরা উঁচু, মাথাটা ভার। যে-শক্ত মুঠি দিয়ে ঘরকন্নাটাকে সে ধরে রাখে, আজ সহসা সেই মুঠি যেন তার আলগা হয়ে গেছে।

অনু তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে কপালে হাত রেখে বলে, গা ত' গরম হয়েছে!

শশধর যেন আর্তনাদ ক'রে উঠলো, হ্যাঁ, হয়েছে—কিন্তু না, এ কিছু না অনু······ও আমার কিচ্ছু হবে না। তুমি ভয় পেয়ো না, আমি কালই ভালো হয়ে উঠবো।

অনু ভয় পেয়েছে কিনা সে পরের কথা, কিন্তু শশধর নিজেই ভয় পেয়েছে সন্দেহ নেই। অনু ঘরে গিয়ে তার বিছানাটা গুছিয়ে দিল।

অন্যদিনের মতো ছেলেমেয়েরা কলরব কোলাহলে মুখর, কিন্তু শশধর আজকে সমস্তটার থেকে ছুটি নিয়ে এড়িয়ে যায়। নিজের অসুস্থতাটা তার কাছে ভয়াবহ। এক সময় ধীরে ধীরে খামারে নেমে গিয়ে সে মাটির নীচের থেকে এক টুকরো আদা তুলে নিয়ে আসে। উঁকি মেরে দেখে

আসে গোয়ালের দরজা বন্ধ কিনা এবং বাছুরটা কোথায় বাঁধা আছে। তারপর ফিরে এসে বলে, আদা দিয়ে আমাকে একটু চা ক'রে দাও ত' অনু ?

অনু আজ যেন একটু কঠিন হয়ে উঠে। বলে, না, চা তোমাকে দেবো না।

দেবে না ? তোমার শরীর বুঝি ভালো নেই, অনু ?—শশধর যেন কেঁদে উঠে।

অনু বলে, তুমি চুপ ক'রে শুয়ে পড়ো গে, কথা বলবে না একটিবারও।

বলবো না ? কথা বলবো না ?—শশধর আবার যেন ফুঁপিয়ে উঠে। কিন্তু অনুর কঠোর কণ্ঠ শুনে আর তার বসবার সাহসও ছিল না। সে ধীরে ধীরে বিছানায় শুয়ে চোখ বুজলো। ছেলেমেয়ে মহলে নানাবিধ তোলপাড় হচ্ছিল, কিন্তু আজ সমস্তটার থেকে সে যেন ছিটকে গিয়ে পড়লো অন্য জগতে।

অনু এক সময় এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল এনে তাকে বললে, খেয়ে নাও।

বড্ড ঠাণ্ডা, নিমোনিয়া হবে যে !

বোশেখ মাসে নিমোনিয়া হয় না, খেয়ে নাও।

তবে খাবো বলছো ? দাও ?—সমস্ত জলটুকু শশধর এক চুমুকে খেয়ে নিল। তারপর চোখ বুজে শুয়ে শুয়ে হাঁপাতে লাগলো।

রাত গভীর হতে থাকে। ক্রমে ক্রমে এক একটি শিশু ঘুমিয়ে পড়ে। আহারাদি সেরে ছোটখাটো ফাই ফরমাস খেটে মাতু আর মিনু বিছানায় শোয়। অনু এবার ঘরদোরের সমস্ত কাজ একটির পর একটি সেরে নেয়। তার চোখে মুখে যেন বিশেষ কোনো উদ্বেগ দেখা যায় না।

কাজকর্ম সেরে রান্নাঘরের পাট চুকিয়ে অনু ঘরে এসে শশধরের বিছানার একপাশে বসে। কপালে হাত দিয়ে দেখলো, জ্বরটা বেশ এসেছে। শশধর জেগেই ছিল, বললে, হাঁসগুলোকে বন্ধ করেছ ?

হ্যাঁ।

ছাগল দুটো ফিরেছে ?

হ্যাঁ।

বাছুরটা ঘাস পেয়েছিল ?

হ্যাঁ।

কুকুরটার আওয়াজ পেলুম না ত ? বেড়ালের বাচ্চা দুটো বেঁচে আছে ত ?

আছে।

শশধর ক্ষীণকণ্ঠে বললে, তুমি বুঝি আমার ওপর রাগ করেছ, অনু ?

অনু বললে, না, কিন্তু তোমার পায়ে ধরি, এবার একটু চুপ ক'রে থাকো।

কিছুক্ষণ পরে শশধর বললে, আজ খাবো কি আমি ?

কিচ্ছু না।

সে কি ? না খেলে বাঁচবো কি করে ?

অনু তার প্রশ্নের জবাব দেবার প্রয়োজন মনে করলো না। শশধর ব্যাকুল হয়ে এক সময় বললে, আমি না বাঁচলে তোমাদের দেখবে কে ? ওদের মানুষ করবে কে ? তোমরা দাঁড়াবে কোথা ?

অনু বললে, কেউ যাদের নেই তারা দাঁড়ায় কোথায় ?

আর্তকণ্ঠে শশধর বললে, এ তুমি কি বলছ, অনু ?

অনু বললে, ভুল বলছিনে।

তুমি আজ এমন হ'লে কেন ?

আমি এক রকমই আছি।

আমি মরে গেলে তুমি সহ্য করতে পারবে ?

অনু বললে, কোনো মানুষই বাঁচে না !

শশধর কেঁদে উঠলো, কে দেখবে তোমাদের ?

তুমি না থাকলে সেকথা আর ওঠে না !

শশধর অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছিল, এবার খড়কুটো ধরে উঠবার চেষ্টা করলো। বললে, ছেলেমেয়েরা ?

অনু বললে, ওরা তোমারও নয়, আমারও নয়।

ওরা তবে কার ?

সৃষ্টিকর্তার।

ভগ্নকণ্ঠে শশধর বললে, আমার জন্য কি তোমার একটুও কষ্ট হচ্ছে না ?

না।

হচ্ছে না ?

একটুও না। কেননা এতদিন পরে তুমি ছুটি পেলে !

শশধর বললে, হ্যাঁ, ছুটি, বিষম ছুটি ! চিরকালের জন্যে ছুটি। এ ছুটি আর ফুরোবে না। এতদিন ধ'রে আমি চোরাবালির ওপর ঘর বেঁধেছিলুম !

অনু একটা পান চিবোচ্ছিল। এবার মুখ টিপে হেসে বললে, হয়ত কথাটা সত্যি !

সত্যি !—শশধর আবার ফুঁপিয়ে উঠলো। বললে, তুমি কি বলতে চাও তোমাকে আমি কোনোদিন ভালোবাসিনি ?

অনু বললে, না।

তবে যে এত করলুম তোমার জন্যে, সব কি মিথ্যে?

আমার জন্যে কিছুই করোনি।

শশধর বললে, করিনি! কিছু করিনি!

না, নিজের জন্যেই সব করেছ।

নিজের জন্যে!—শশধর উঠে বসবার চেষ্টা করলো।

অনু তাকে ধরে পুনরায় শুইয়ে দিল। বললে, হ্যাঁ, নিজেরই জন্যে। একে ভালোবাসা বলে না,—একে বলে নেশা, মোহ,—এ শুধু নিজেকে খুশী করা!

শশধর বললে, তা হলে বলো তুমিও কোনোদিন আমাকে ভালোবাসনি?

অনু মুখ ফিরিয়ে পুনরায় একটু হাসলো। তারপর বললে, আমার ভালোবাসার জন্যে কোনোদিন ত' তুমি ব্যস্ত হওনি?

শশধর সম্ভবত সেই দিন রাত্রেই উন্মাদ হয়ে পথে বেরিয়ে পড়তো! কিন্তু তার জ্বর বেড়েছিল অনেকখানি, সেইজন্য সে বেহুঁস হয়ে প'ড়ে রইলো।

দূর সম্পর্কের এক পিসিমা দেখতে এলেন পরের দিন সকালে। রোদ লেগে শশধরের খুব জ্বর হয়েছিল গত রাত্রে। অনু অনেক রাত্রে তার মাথাটা বেশ করে ধুইয়ে দেয়। আজ সকালে শশধরের জ্বরটা এতক্ষণে প্রায় ছেড়ে এসেছে। সে ভালোই আছে।

পিসিমা বললেন, আজ আমাবস্তে, তাই কালীঘাটে যাচ্ছি! দেখে গেলুম তোদের ঘরকন্না, ক'দিন আসতে পারিনি।

শশধর বললে, বসো, পিসিমা।

না বাবা বসবো না, ন'টার গাড়ীতে যাবো।—পিসিমা বললেন, ছ'টি ছেলেমেয়ে ঘেটের কোলে। সে দুটি থাকলে আটটিই হোতো। বৌমা একা পেরে ওঠে না। একটা লোক রাখ্, শশধর। আর এদিকে সুখবর রাখিস?—তোর বউয়ের আবার যে ছেলেপুলে হবে রে!

শশধর কিছু একটা জবাব দেবার আগেই পিসিমা বললেন, দুর্গা, দুর্গা,—যাই বাবা, ওদিকে আবার বেলা হোলো।

একটি সন্ধ্যার টুকরো

মেয়েদের কাছে কোনো পুরুষ সত্যি কথা বলে না, এবং স্ত্রীদের কাছে স্বামীরা মিছে কথা বলে সব চেয়ে বেশী।

কিন্তু স্ত্রীর চেয়ে যে বড় ? স্বামীর চেয়েও যে আপন ?

লাবণ্য ধীরে ধীরে কলমটা নামিয়ে রাখলো মোটা কাঁচ-বসানো টেবলের উপরে। এমন কি চিঠির কাগজে কালির আঁচড় তখনও শুকোয়নি—বাইরে জুতোর শব্দ পেয়ে লাবণ্য চিঠিখানা তুলে নিয়ে কুচি কুচি ক'রে ছিঁড়ে ফেললো।

অতি পরিচিত জুতোর শব্দটা ঘরে ঢুকে তা'র পিছন দিকে এসে থমকে দাঁড়ালো। লাবণ্য মুখ না তুলেই প্রশ্ন করলো, এখন বেলা ক'টা ?

অমিয় জবাব দিল, চারটের সময় আসবার কথা ছিল। এখন চারটে বেজে নব্বই মিনিট।

কিন্তু সভাপতি না থাকলে সভার চেহারাটা কেমন দেখায় তা জানো ?

অনেকটা তোমার মেজাজের মতন। দাঁড়াও, ঘাম মুছি আগে। হাঁটতে হাঁটতে...ছুটতে ছুটতে...গেঞ্জি ডিঙিয়ে পাঞ্জাবীটা পর্যন্ত ঘামে ভিজে গেছে। আরে, চিঠি লিখছিলে কা'কে ?

চেয়ারখানা টেনে অমিয় প্রায় পাশে এসে বসলো। লাবণ্য বললে, তোমাকে !

না, এত সৌভাগ্য আমার নয়। চিঠির ছেঁড়া অক্ষরগুলো প'ড়ে রয়েছে মুক্তোর মতন ! ও গুলো যেন আর কোনো দিকে পাঠানো হচ্ছিল !

লাবণ্য বললে, তোমার মতন মিছে কথা আমি বলিনে। চিঠি লিখছিলুম কুন্নুকে।

অমিয় বললে, যাকে চোখে দেখিনি, অথচ বাঁশী শুনেছি, সেই কুন্নু? সেই কুন্নুই ধন্য তোমার জীবনে, আমরা কেউ নই। আমরা হলুম খোসা, কুন্নু হোলো শাঁস।

লাবণ্য উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আর কিন্তু একটুও দেরী করলে চলবে না, ওঠো এইবার।

আরে দাঁড়াও একটু। এ'ত আর সাহেবী সভা নয়, এ সভা বাঙ্গালীর। ঠিক সময়ের পরেও ঘণ্টা দুই হাতে রাখা যায়। তা ছাড়া তোমাদের ডাকা সভা ত? অর্ধেক রাত অবধি সবাই ব'সে থাকবে, ভয় কি? তারপরে গিয়ে কটাক্ষ হেনো, জনসমুদ্রে তরঙ্গের দোলা লাগবে।

আঃ একটু আস্তে বলো। বাড়ীতে কি লোক নেই?

অমিয় বললে, বিশ্ব-সংসার একদিকে, আর তুমি আর এক দিকে।

লাবণ্য বললে, বটে, কিন্তু স্তুতিবাদটা সত্যবাদ নয়, মনে রেখো। কুন্নুকে আমি সেই কথাই লিখছিলাম।

কুন্নু কি তোমার মতনই বিদুষী?

ঠাট্টা রাখো।

শুনিই না?

এম-এ পাশ না করলে আমি কোনো লেডী টিচারকে আমার ইস্কুলে নিইনে, তা জানো?

অমিয় বললে, এতগুলি বিদুষী তোমার দুইপাশে, তবে আমাকে দিয়ে ইস্কুলের চাঁদা তোলাবার এত চেষ্টা কেন?

লাবণ্য এবার হাসলো, এতক্ষণ পরে হাসলো। বললে, তোমার মতন গুছিয়ে মিছে কথা কে বলবে? আর চাঁদা ওঠে মিছে কথায়। তোমার বক্তৃতায় বারুদ নেই, অথচ আগুন আছে—যেমন ইলেকট্রিক। বস্তু নেই, অথচ বাস্তবতা। এতটুকু সত্যি নেই, অথচ মুগ্ধ শ্রোতারা চাঁদা দিয়ে বাড়ী যায়।

অমিয় বললে, এবার বুঝতে পারছি তোমাদের কাছে আমার দাম কতটুকু।

লাবণ্য বললে, ওঠো এইবার।

আজ কত টাকা চাই?

ইস্কুলের বাড়ী তৈরী, আসবাব পত্র কেনা, লোকজন রাখা,—বাকি সবই ত' তুমি জানো।

হ্যাঁ, বাকি সবই জানি, তা'র চেয়ে জানছি তোমাদের। তোমরা গুছিয়ে নিতে পারো, যদি কেউ গুছিয়ে দেয়। গাছ পুঁতে দেবো আমরা, ফল খাবে তোমরা। আগে ঘর বানালে খুশী হতে, এখন ঘর ছাড়ালে খুশী হও। পুরুষ-ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে নারীসওয়ার চলেছে দিগ্বিজয়ে, মাঝে মাঝে আবার দিচ্ছ চাবুক বসিয়ে। বোকা পুরুষ এই নিয়ে আবার লেখে কবিতা। আমি হলুম মিথ্যেবাদী, আর তোমার রুনুর কাছেই বুঝি তুমি সত্যি কথা লিখছিলে?

লাবণ্য এবার মুখ রাঙা ক'রে বললে, আজ তোমার মেজাজ দেখে ভয় হচ্ছে।

কেন?

আজ বোধ হয় চাঁদা উঠবে না।

অমিয় হাসিমুখে পকেট থেকে একতাড়া নোট বা'র করলো। বললে, তবে এই নাও, আড়াইশো টাকা।

সবিস্ময়ে লাবণ্য বললে, কোত্থেকে পেলে ?

মেয়েরা মেয়েদের বিশ্বাস করে না,—বিশ্বাস করে পুরুষকে। এ' টাকা মেয়েদের আঁচল থেকেই ছিনিয়ে আনা।

ঠকিয়ে আনলে ?

না, রসিয়ে এনেছি।

অর্থাৎ ?—লাবণ্য বড় বড় চোখে তাকালো।

অমিয় বললে, ভয় নেই, হাত পেতে নাও।

ভয়ের জন্যে নয়, ভাবনার জন্যে।

অমিয় হেসে উঠলো। বললে, ভাবনা কিসের ?

লাবণ্য বললে, তোমাকে বিশ্বাস করিনে। তুমি চোরাবালি।

তবে নোঙ্গর করেছ কেন ?

হারাবার ভয় না থাকলে আনন্দ পাইনে। কিন্তু এবার চলো, ওঠো।

কোথায় ?

সভায়।

সভা যে মুলতুবী !

তার মানে ?

হাতে লিখে দরজার সামনে নোটিশ টাঙিয়ে রেখে এসেছি,—অনিবার্য কারণে লাবণ্য রায়ের সভায় যোগদান অসম্ভব। সভাপতি নিরুদ্দেশ।

একথার মানে জানো ?

জানি। স্কুল কমিটির নেত্রী এবং সভাপতি উভয়ে গোপনে সান্ধ্য ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন !

লাবণ্য প্রশ্ন করলো, এই খবরের পরে স্কুলের ভবিষ্যৎটা কি, ভেবে দেখেছ ?

অমিয় হাসিমুখে বললে, আবছা অন্ধকার! যেমন শুক্লা পঞ্চমীতে সন্ধ্যার দিকে ভিক্‌টোরিয়া মেমোরিয়লের নিরিবিলি দক্ষিণের অংশটা। কিছু বোঝা যায় না।

কিন্তু তুমি আবার মিথ্যে কথা বলছ? তোমার কথায় এবার সত্যি ভয় হচ্ছে।

কিছু ভয় নেই। নোটিশ প'ড়ে অন্তত এ কথা মনে হবে না যে, তুমি আমি অন্তরঙ্গ।

কিন্তু কুমুর চোখ এড়াবে না তা জানো ?

আমার চেয়ে কুমু তোমার অন্তরঙ্গ !

সে একশোবার।

হায় কুমু যদি পুরুষ হতো।

সে পুরুষের চেয়েও বড়।

অমিয় প্রশ্ন করলো, কি রকম ?

তার হাতে আজো চুড়ি ওঠেনি, মাথায় চিরুণী পড়েনি। তা'র চোখ দুটো বন্য। স্বভাবে অনন্য। পা টিপে হাঁটেনা, সঙ্কোচের ছায়া নেই মুখে। কুমু আজো পুরুষকে আবিষ্কার করেনি।

দেখতে কেমন ?

আজো তুমি যা দেখোনি।

বয়স ?

পাথরের টুকরোর বয়স নেই।

অমিয় কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। পরে বললে, রাঁধতে জানে তোমার রুনু ?

অপর কারো হাতের রান্না সে খায় না।

গেরুয়া পরে কি ?

দশ হাত আচ্ছাদন হলেই সে খুশী।

হুঁ—অমিয় কি যেন ভেবে নিল। পরে বললে, রুনুর প্রচারকার্য আর কতদিন করবে তুমি ?

লাবণ্য বললে, চন্দ্র সূর্য যতদিন।

অমিয় বললে, স্বাধীনতা-মার্কা মেয়ে বুঝি তোমার রুনু ?

সে আজন্ম স্বাধীন।

পুরুষ বিদ্বেষী ?

তোমার কথা অশ্রদ্ধেয়।

অমিয় বললে, মেয়েরা লেখাপড়া শিখলেও রূপকথার মায়া কাটাতে পারে না। প্রণয়ীকে জাগিয়ে রাখে রস-কল্পনায়, স্বামীকে ভুলিয়ে রাখে আলস-কল্পনায়, শিশুকে ঘুম পাড়ায় রূপ-কল্পনায়। একেই বলে কৈশোর। সত্যি রুনু কোথায়, তুমি জানো না। কিন্তু মিথ্যে-রুনুকে নিয়ে নাচতে তোমার আপত্তি নেই।

লাবণ্য বললে, আমি কি ভাবছি জানো ?

তোমার ভাবনা ঘোচাবার জন্যেই ত' আমার আবির্ভাব !

আঃ থামো একটু ! বাজে ব'কোনা। আমি ভাবছিলুম তুমি স্বামী হ'লে কি করতে।

অমিয় বললে, পুরুষের সামনে দাঁড়িয়ে এ কথা ভাবে সব মেয়ে। নতুন কিছু না। তোমাদের ভাবনা বিয়ে পর্যন্ত, আমাদের ভাবনা আরম্ভ

বিয়ের পর থেকে। কিন্তু আমি স্বামী হ'লে কি করতুম, এ অতি সামান্ত কথা। পাঁচটা চরিত্রবান স্বামীর মতন স্ত্রীকে লুকিয়ে জানলা দিয়ে উঁকি-ঝুঁকি মারতুম। তবে এটা তেমন সমস্যা নয়, সমস্যা হোলো এমন স্বামীর স্ত্রীটি কে ?

কোনো আধুনিক মেয়ে !

সে ত' বলাই বাহুল্য। দিদিমার বান্ধবীকে কেউ বিয়ে করতে ছোটে না।

লাবণ্য বললে, যার মন আধুনিক।

আজকের আধুনিক, কালকের প্রাচীন ! আধুনিক শব্দটা অর্থহীন ব'লেই হাস্যকর।

লাবণ্য বললে, ধরো সকল সংস্কার-মুক্ত !

ওটাও অর্থহীন। একশো বছর আগে বাড়ীতে অতিথি এলে তা'কে ভূরিভোজন করানো হোতো, আজ মাত্র এক পেয়ালা চা দেওয়া হয়। আগেকার কালে বন্ধু-পত্নীর জন্য সোনার তাবিজ গড়িয়ে আসতো, এখন বড় জোর একটা প্রিম্‌রোজ্ ! অর্থাৎ সংস্কার কাটেনি।

লাবণ্য জবাব দিল, আগেকার কালে মেয়েরা ইস্কুল পড়তে ছুটতো না।

অমিয় বললে, ইস্কুলের চেয়ে বড় কিছু পড়তো তারা। মনে করো রাণী ভবানী, অথবা চাঁদ সুলতানা। ইতিহাসের আগে যাও, পুরাণে—সেখানেও একই কথা। সংস্কার কিছু বদলায়নি, বদলেছে কিছু অভ্যাস।

এবার ওঠো।—লাবণ্য বললে।

না, উঠবো না, কথার জবাব দাও।

কোন্ কথার ?

কেমন স্ত্রী হ'লে আমার সঙ্গে মানাতো !

রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে খোঁজগে। আমাকে এখনি বেরোতে হবে।

কোথায়?

চুলোয়। টাকার সন্ধানে! এই আড়াইশো টাকা কতটুকু?

অমিয় বললে, কাল যদি আড়াই হাজার এনে দিই?

সে-ক্ষমতা তোমার নেই!

অমিয় হেসে উঠলো। বললে, তবে শোনো। তুমি চাঁদা তুলতে গেলে ভালোবাসা পাবে, টাকা পাবে না। উপহার পাবে, উপকার পাবে না। বড় জোর চেহারাটার বদলে কিছু হাত খরচ পেতে পারো।

লাবণ্য বললে, আঃ গলা নামিয়ে বলো। এসব নোংরা কথা বলতে মুখে বাধে না?

নোংরা কোন্‌টা?

তুমি যেদিকে ইঙ্গিত করছো?

অমিয় বললে, তোমার চেহারা কুশ্রী হলে আমি কি চাঁদা তুলতে ছুটতুম? কোথায় পেতে আড়াই শো, আর আড়াই হাজার?

লাবণ্য বললে, তাহলে স্বীকার করো, আমার কাজের প্রতি তোমার কোনো শ্রদ্ধা নেই?

অমিয় জবাব দিল, তুমি কি আমাকে আদর্শবাদী যুবক বানাতে চাও?

তুমি কাজের লোক হলেই আমি খুশী।

কোন্ কাজের?

আমার সব কাজের!

অমিয় সহাস্যে বললে, তোমার গলার আওয়াজে একটু কাঁপন লাগছে যেন?

খুব স্বাভাবিক—লাবণ্য বললে, তুমি আমাকে কথায় কথায় কোন্ঠাসা করতে চাও!

বাইরে কা'র পায়ের শব্দ হোলো। গলা বাড়িয়ে লাবণ্য বললে, কে? নারী কণ্ঠের জবাব এলো, আমি, লাবণ্যদি।

ও, রুনু? এমন অসময়ে? এসো—

রুনু ভিতরে এলো। লাবণ্য ঈষৎ উদ্‌ভ্রান্ত, কিছু চঞ্চল। বললে, আপনার সঙ্গে রুনুর পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি অমিয় চৌধুরী, প্রফেসর—আমাদের পেট্রন্।

অমিয় বললে, ব্যস, ওতেই হবে। কিন্তু ওঁর সঙ্গে আগেই আমার আলাপ হয়েছে!

লাবণ্য সবিস্ময়ে বললে, হয়েছে? কবে?

ঘণ্টা দুই আগে পর্যন্ত ওঁর সঙ্গে ব'সে গল্প ক'রে এসেছি। উনি যে রুনু তা জানতুম না, কিন্তু ওঁর কথা—আমার আশ্চর্য মনে হয়েছে।

রুনু বললে, সভার কাজ আজ মুলতুবী রইলো, আমি নোটিশ দিয়েছি।

তুমি কখন গিয়েছিলে?

সব প্রথম।

কেন বলো ত?

আপনার কাগজপত্র গুছিয়ে দেবার জন্য। পরে ইনি গেলেন। উনি জানালেন, সভা আজ হবে না।

লাবণ্য হেসে হেসে বললে, অমিয়বাবু কেবল এই খবরটুকু দিতে গিয়েই বুঝি গল্পে মেতে গেলেন তোমার সঙ্গে?

অমিয় গলা ঝাড়া দিয়ে হেসে বললে, কথাটা ঠিক হোলো না। ওঁর আলাপের মাধুর্যটাও প্রায় আধুনিক কথাসাহিত্যের মতন। অর্থাৎ জমে গেলে ব'সে যেতে হয়। বাদলার সন্ধ্যায় যেমন চানাচুরের আসর।

রুনু মুখ রাঙা ক'রে বললে, আমি এবার যাই, লাবণ্যদি।

আচ্ছা এসো।—

লাবণ্য রুনুর পথের দিকে চেয়ে রইলো।—

কে যেন আলোটা নিয়ে চ'লে গেল ঘরের থেকে। একটু গুমোট, ঈষৎ গ্লানি। কথার খেই হারিয়ে গেল, তর্কটা গেল থেমে। বাতাসটা যাকে বলে ভার-ভার।

অমিয় বললে, এবার আমি উঠি।

কোথায় যাবে?

পড়াশুনো আছে।

লাবণ্য বললে, পড়াশুনোর অছিলায় আর কোথাও যাবে কি?

অমিয় মুখ টিপে বললে, রুনু বলছিল ওর থিসিসটা নিয়ে একটু আলোচনা করবে!

বাঁকা চোখে চেয়ে লাবণ্য বললে, যেমন আলোচনা তুমি আমার সঙ্গে করেছিলে তিন বছর আগে?

সেটা ব্যক্তিগত, এটা নৈর্ব্যক্তিক!

লাবণ্য বিষোদ্গার ক'রে বললে, তরুণ অধ্যাপকরা জানে, কান টানলেই মাথা আসে।

অমিয় উচ্চহাস্য ক'রে সেদিনকার মতো উঠে দাঁড়ালো!

চিঠিখানা অতি দ্রুতহস্তে লাবণ্য শেষ ক'রে একবার প'ড়ে নিল—

ভাই রুনু, স্কুল কমিটির জরুরী সভায় স্থির হোলো আপাতত সব কাজ বন্ধ। দেশের জরুরী অবস্থা একটু না ফিরলে আমাদের কাজ এগোবে না। টাকাকড়ি উপস্থিত ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রইলো। কিন্তু তোমাকে বসিয়ে রাখার ইচ্ছা আমার নেই। টাকা পাঠালুম, কালকেই তুমি গোরখপুরের দিকে রওনা হয়ে যেয়ো,—ওখানে হেড-মিসট্রেসের কাজটা নিয়ে আপাতত তুমি ব'সে যাও! অন্যথা করো না।—তোমার লাবণ্যদি।

অত্যন্ত খুশী মনে লাবণ্য সে-রাত্রে বিছানা নিল।

যেমনটি তেমনি

হ্যাঁ, সত্যি বলতে কি, আকাশ থেকে প’ড়েছিলুম—বলতে বলতে চিঠিখানা রেখে দিলুম টেবলের ওপর—এমন কি আমার এই চোখ দুটোকেও বিশ্বাস করিনি, নিজেকেও বিশ্বাস করিনি—

কেন ?

তবে শোনো। আমার আত্মীয় নন্, এমন কোনো মেয়ে আমার স্বপ্নের অগোচর। তোমার চিঠি পেয়ে ঠিক যেন তোমাকে আবিষ্কার করলুম, হঠাৎ যেন খুঁজে পেলুম নিজকেও। আশ্চর্য, তোমার নামটা মনে প’ড়ে গিয়ে চমকে উঠলুম।

মরণদশা আমার! কল্যাণী বললে, একবেলার জন্যে ছেলেপুলে নিয়ে উঠলুম তোমার এই হরিঘোষের গোয়ালে,—কিন্তু তোমার এসব কথাবার্তা শুনলে ছেলেমেয়েরা কি ভাববে বল ত ?

ভাববে আমি বোধ হয় মায়ের বন্ধু !

বন্ধু ! ছাই আর পাঁশ। ছি—

তাহ’লে মায়ের বন্ধু—মামা ! যেমন অনেক ছেলে-মেয়ে আজকাল ব’লে থাকে।

সে মন্দের ভালো।—দাঁড়াও আসছি।

কল্যাণী উঠে বাইরে যায়।

কিছুক্ষণ পরে জলযোগ সেরে এসে কল্যাণী বলে: একবেলার জন্যে তোমার এখানে এলুম বটে—কিন্তু অনেক ভেবে তবে তোমাকে চিঠি দিয়েছি।

তোমার ভাবনার ধারাটা একটু শোনাও দিকি ?

ভাবলুম আমাকে তোমার মনে আছে কিনা। অবিশ্যি মনে রাখবারও কোন কারণ ঘটেনি। তবু একদিন দেখা হয়েছিল ত ? কিন্তু ঠিক লিখতে বসে মনে হোলো, তুমি ব'লে ডাকবো—না আপনি! শেষ কালে তুমি বলেই লিখলুম।

কেন লিখলে ?

কম বয়সে তুমি পাতানো যায় সহজে, কিন্তু ষাট বছরের বুড়ো ডাকুক দেখি তো পঞ্চান্ন বছরের মহিলাকে তুমি বলে ? অথচ দেখেছ আশ্চর্য,— আঠারো আর তেইশের মধ্যে তুমি আসে কত সহজে ?—কল্যাণী তার অতীতকালের থেকে কিছু যেন একটা খুঁজে পায়।

তোমার বয়স এখন ঠিক কত ?—সোজা প্রশ্ন করলুম।

আমার চার-পাঁচটি ছেলেপুলে তা জানো ?

এরা ক'বছরের মধ্যে হয়েছে ?

তা ধরো বড় ছেলের বয়স পনেরো, আর কোলেরটির বয়স তিন !

চার-পাঁচটি বললে কেন ? চারটি, না, পাঁচটি।

আমার পিণ্ডি !—কল্যাণী মুখ ফিরিয়ে নেয়। একটু পরে পুনরায় বলে, মেয়েমানুষের আবার বয়সের হিসেব! বয়সের কথা উঠলে আমরা বাপু ভয় পাই। যতদিন ছেলেপুলে হয় ততদিন মেয়েরা বুড়ো হয় না, এই জেনে রেখো।

তোমার স্বামী লোকটি কেমন ?

বিয়ের বাসরের পর থেকে আর ভেবে দেখিনি।

স্ত্রীর বন্ধু থাকা তিনি পছন্দ করেন ?

আবার ওই মন্দ কথা? কাঁঠালের আমসত্ত্বে কোনো স্বামী বিশ্বাস করে?

কিন্তু এই যে তুমি এলে এখানে?

আসবো না কেন?—কল্যাণী খরকণ্ঠে অভিযোগ জানালো—ছেলে-পুলে নিয়ে একবেলার জন্যে রাস্তায় দাঁড়াবো? হোটেল আমি চিনিনে, ধর্মশালা জানিনে, কলকাতায় একরাত্তিরের জন্য ঘর ভাড়া পাবো না, তা ছাড়া জিনিসপত্তর সামলানো,—এসব করবে কে? পুরুষ মানুষ নইলে চলে? ছোট ভাই গেছে বিলেতে, কাকার ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছি। এখানে আসবো না ত' যাবো কোন্ চুলোয়?

হেসে বললুম, এটাও ত চুলো, এখানেও আগুন জ্বলছে ধিকি ধিকি। অনেকটা রাবণের চুলো,—নেভে না!

তোমার বৌকে দেখছিনে কেন? কোথায়?

তোমার ভাষাতেই বলি,—চুলোয়!

মানে? ম'রে গেছে বুঝি?

হাসলুম।

ঠোঁট উলটিয়ে কল্যাণী বললে, ভালোই হয়েছে,—সত্যি বলতে কি! বেঁচে থাকলেই ত' বছর-বছর বিউতো! মাগির হাড় জুড়িয়ে গেছে।

মেয়েমাত্রই দুঃখ পায়, একথা তোমায় কে বললে?

বাইরে থেকে ডাক এলো, মা?

ওই যা, ভুলে গেছি।—ব'লে কল্যাণী উঠে পড়লো। বাইরে তা'র ছেলেমেয়েরা কোলাহল সুরু করেছে।

পঁচিশ বছর আগে কল্যাণী কেমন ছিল আমার মনে পড়ে না। অত্যন্ত সামান্য আলাপ, এবং সে-আলাপের কোনো দাগই আমার মধ্যে

নেই। অনাত্মীয় কোনো পুরুষের সঙ্গে অল্পকালের আলাপও মেয়েরা কোনো কালে ভোলে না, কিন্তু সহজে প্রকাশও করে না। পুরুষ ভোলে, খুব সম্ভব ভোলে,—কেন না তা'র হাতে অনেক কাজ, অনেক ভাবনার দায়। মেয়েরা জমিয়ে রাখে মনের ভাঁড়ারে,—যথাসময়ে কৃপণের ধন বা'র করে, এবং প্রত্যেকটির বিনিময়ে কাজ আদায় করে। কোন্ পুরুষের কাছে কতটুকু ওজনে হাসতে হবে, কিংবা চোখ বাঁকাতে হবে—এ জ্ঞান তাদের সহজাত। সেইজন্য দানবকে দেখলেও মেয়েরা ভয় পায় না,—দুর্ভাবনায় পড়ে মাত্র।

সমস্ত দিন আমাকে কল্যাণীর ফরমাশ খাটতে হোলো। তা'র ছেলেমেয়েদের জমা তৈরির ছিট-কাপড়, তার মাথার চিরুনি, দাঁত কন-কনানির ওষুধ, বাচ্চার সাগুবার্লি, ভবিষ্যতের জন্য অয়েল-ক্লথ, বড় ছেলের চটি জুতো, স্বামীর জন্য রুমাল আর দাড়ি-কামাবার সরঞ্জাম, মেজ মেয়ের স্কুলের বই—কোনোটাই সে ভোলেনি। স্বামী যে-দেশে বদলী হয়েছে, সেখানে নাকি কিছু পাওয়া যায় না। একবারও সে জানতে চাইলো না যে, আমার ভাগ্যে সারাদিনে এক পেয়ালা চা জুটলো কিনা, অথবা আমার ট্রাম-বাস ভাড়া কত লাগলো। তিরিশটি টাকা হাতে দিয়ে বললে, এতেই সব হয়ে যাবে, দরদস্তর ক'রে কিনো। দেশী চিরুনি এনো, রবিনসন্ বার্লি, হ্যাণ্ডলুমের ছিট্,—তোমাকে যেন ঠকিয়ে নেয় না।

সন্ধ্যার পর ফিরে এসে তাকে জিনিসপত্র বুঝিয়ে দেবার পর সে বললে, তুমি এমন মিথ্যেবাদী কেন?

মুখ তুলে তাকালুম। সে বললে, আমাকে তুমি এমন ক'রে ঠকাবে, আমি জানতুম না।

আমি তাড়াতাড়ি দোকানের রসিদগুলো ব'র ক'রে দিলুম। বললুম, আমি কখনও কারুকে ঠকাইনে, বিশ্বাস করো।

নয়ত কি ?—এই ত তোমার রাঁধুনী বামুন বললে যে, তুমি বিয়েই করোনি !

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললুম, ওঃ এই কথা ! আমার কথায় কি তুমি আমাকে বিপত্নীক ঠাউরেছিলে ?

ঘাড় বাঁকিয়ে কল্যাণী বললে, তুমি দেখছি অনেক রকমের ভঙ্গী জানো ? যাকে বলে বহুরূপী ! এ বাড়ীটায় বুঝি ফাঁদ পেতে রেখেছ ?

বললুম, ছি, একদিনের জন্যে এসে এসব কথা তোমার মুখে বিশ্রী শোনায় !

কল্যাণী চোখ পাকিয়ে বললে, তবে এত ঢাকাঢাকি কেন ? কোথাও বুঝি কিছু আছে ?

এবারে কঠিন কণ্ঠে বললুম, ছিল—বছর পঁচিশেক আগে, এখন নেই !

বললেই পারতে বিয়ে করিনি ! তা হলে আমি আর ওই তিরিশটে টাকা খরচ করতুম না ?

মানে ?

বউ ত' নেই,—এত টাকা করবে কি ? আমার মেজ ছেলেটাকে এখানে রেখে পড়াও না কেন ? আমাদেরও বেশ কলকাতায় একটা আস্তানা হয় !

আমার কাছে মানুষ হলে তোমার ছেলে ত সত্যবাদী হবে না !

পুরুষ মানুষ সত্যবাদী হয় না—যুধিষ্ঠিরও হন নি। কিন্তু আমাদের খরচটা বাঁচতে পারতো !

বেশ ত, তুমি ঠিকানা রেখে যাও,—আমি মাসোহারা পাঠাবো!

কল্যাণী বললে, কোন্ সুবাদে?

মায়ের বন্ধু—মামা!

পোড়া কপাল!—কল্যাণী বেরিয়ে গেল।

ঘণ্টাখানেক পরে গিয়ে উঁকি মেরে দেখি, সে একা এইমাত্র পরম পরিতৃপ্তি সহকারে আহারাদি সেরে উঠলো। আমার খোঁজ নেয়নি। কিন্তু সেদিন অনেক রাত্রে সে হঠাৎ আমার ঘরে ঢুকেছিল। ভিতরে এসে বললে, এমন বেমক্কা কেন তুমি?

কি শুনি?

তোমার গা কি গণ্ডারের চামড়া? মশা কামড়ায় না?—এই ব'লে সে বিরক্তভাবে মশারিটা ফেলে দিয়ে যেমন এসেছিল তেমনি আবার বেরিয়ে গেল।

পরদিন সকালে স্বামী এসে পৌঁছলেন। এ বাড়ীখানা কার, কে থাকে, স্ত্রীর কোনো আত্মীয় কি না, আমি কেমন লোক,—কোনো ভ্রূক্ষেপই তিনি করলেন না। বামুন ঠাকুর রাঁধলো, স্ত্রী তাঁকে কাছে বসিয়ে খাওয়ালো,—পরে সেই থালার ব'সে স্বামীর উচ্ছিষ্ট ভোজন করলো।

যাবার সময় দরজার সামনে গাড়ী এসে দাঁড়ালো। স্বামী উঠলেন আগে ছেলেমেয়ে নিয়ে,—যেন বস্তাবোঝাই মালগাড়ী।

কিন্তু একসময় কল্যাণী আমার কাছে ছুটে এলো। বললে, একবারটি শোনো। ও'র গায়ে অত জোর নেই, তুমি গিয়ে গাড়োয়ানের সঙ্গে একবার তোরঙ্গটা ধ'রো দেখি?

চিতাবাঘ নয়, শৃগাল নয়, এমন কি পোষমানা বিড়ালও নয়,—ওর নাম হোলো গরু!

আমার এক বন্ধু বললেন, গরু গাছে ফলে না। চোখ-কান আছে, কিন্তু দাঁত একপাটি নেই। রোমন্থন করে, ঝিমোয়,—এবং বাৎসরিক সন্তান প্রসবে কোনো কাতরতা নেই। প্রাণ আছে কিন্তু মৃত। যতদিন দুধ দেয়, সবাই বলে গোমাতা; ম'রে গেলে তা'র চামড়ায় নিজেদের জুতো বানায়।

আমি হাসবো কি না ভাবছিলুম।—

ভ্রান্তি

ছোট মেয়েটাকে মানুষ ক'রে তোলার জন্য কুন্দর মাকে কাজ করে বেড়াতে হোতো পাড়ায় পাড়ায়। ঘরে রেখে যেতো মেয়েটাকে—মেয়েটা ভেসে বেড়াতো এখানে ওখানে—সাঁতার কাটতে যেতো ভিন্ন পাড়ার পুকুরে, আম পাড়তে যেতো মাঠ পেরিয়ে আরো দূরে, কিংবা নিজের মনে গা ঢাকা দিত গাজনতলার ওদিকে—আর কুন্দর মা পাড়াঘরে এঁটো বাসন মাজতো, শাক কুড়িয়ে বেচে আসতো মুস্তফীরদের ঘরে, গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটে দিত বেড়ার গায়ে, কিম্বা বিলের মধ্যে গলা জলে নেমে কচি কচি কলমী শাক তুলে নিয়ে দিয়ে আসতো নায়েব মশাইয়ের বড়বৌমার রান্নাঘরে। এমনি করেই অন্ন সংস্থান করতো কুন্দর মা নিজের জন্যে কিম্বা কুন্দর জন্যে।

কুন্দর কি চোখে পড়তো মায়ের এত কষ্ট? এর বাইরে কি কোন জীবন আছে জানতো? কেউ মারতো মেয়েটাকে চুলের ঝুঁটি ধ'রে, কেউ রাগ ক'রে চুবিয়ে দিত বিলের পাঁকালো জলে, আবার পাত কুড়িয়ে একমুঠো ভাতও ওর মুখের সামনে ফেলে দিত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে। মেয়েটা এগিয়ে আসতো আহ্লাদে—যেমন ল্যাজ নাড়তে নাড়তে এগিয়ে আসে পথের নেড়ি কুকুর। গোগ্রাসে গিলতো সেই অপমানের অন্ন পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে। কখনও যদি এ দৃশ্য কুন্দর মা'র চোখে পড়তো, তবে সে আনন্দে চোখের জল মুছে বলতো, পাঁচজনের দয়া, পাঁচজনের পাত কুড়িয়েই ত' মেয়ে আমার মানুষ!

মেয়েটার চেহারাটা ছিল ভালো, স্বাস্থ্যটা তার চেয়েও ভালো। বোধ হয় কখনও সুখ আর যত্নের আস্বাদ পায়নি ব'লেই অসুখ করতো না। আশ্রয় যাদের কোথাও ছিল না, প্রকৃতি তাদের কোলে নিয়ে সযত্নে সুস্থ রেখে দিয়েছে। মেয়েকে নিয়ে কুন্দর মা কখনও রাত কাটিয়েছে নায়েব মশাইয়ের গোয়ালে, কখনও হরিসভার দাওয়ায়, আবার শীতকালে কখনও বা কারো পাকাধানের স্তূপাকার উত্তাপের কোলে। ওদের সত্যিই কোনো আশ্রয় ছিল না।

কুন্দর মার আশা ছিল, ভালো জায়গায় মেয়েটার বিয়ে দিতে পারলে তা'র আর ভাবনা থাকবে না। কিন্তু ভালো জায়গা বলতে তা'র ধারণা কতটুকু? এ গাঁয়ের হাটতলার বাইরে আর কোথাও কোনো ভালো আছে কিনা তাই বা সে জানে কতটুকু? সুতরাং মেয়ের ভবিষ্যৎ কল্পনা সামনের ওই বাঁশবাগান পেরিয়ে গাজনের বিল ডিঙ্গিয়ে বেশীদূর আর চলতে পারতো না। সারাদিনের পরিশ্রান্ত দেহটা এলিয়ে কুন্দর মা এক সময়ে মেয়েটার পাশে অকাতরে ঘুমিয়ে পড়তো।

এমনি করেই কুন্দ বড় হয়েছিল। মা একদিন বললে, রাজুর সঙ্গে যাবি—বেশ ত'! দুজনে মাছ ধরবি, বাজারে বেচবি, মোটা পয়সা—। রাজু কেমন সুন্দর ঘর বাঁধতে জানে। যখন মাছ ধরতে ইচ্ছে হবেনা, তখন দুজনে ঘরামির কাজ করবি, তুই বাঁশ ছেঁচে দিবি? গতর খাটা পয়সা মারবে কে? আমি তোদের ঘর গুছিয়ে দিয়ে আসবো। কানে মাকড়ি, হাতে বালা—

কুন্দর মা মেয়ের ভবিষ্যৎ স্বপ্নে বিভোর হয়ে ওঠে। খবরটা কালকেই সে নায়েব মশাইয়ের বড়বৌমাকে দিয়ে আসবে।

দিন তিনেক পরে ভোর রাত্তিরে উঠে গিয়ে রাজুর হাতে কুন্দকে সে ছেড়ে দিয়ে এলো। রাজু নিজেই নৌকা চালায়। নৌকায় তুলে রাজু বললে, বেশ মজা হবে, বেলডাঙ্গার খালের ভেতর দিয়ে আমরা যাবো। তুই রাঁধতে জানিস ত?

কুন্দ খুশী হয়ে বললে, খুব জানি।

মোল্লাহাট পেরিয়ে ওদের নৌকা এসে থামলো ময়রাটুলির ঘাটে। রাজু এসে উঠলো ওর এক পিসির গাঁয়ে।

ওখানে ছিল চৌধুরীদের বাড়ী। কুন্দ সেখানে বাসন মাজার কাজ নিল,—মাসে পাঁচ টাকা। রাজু ঘরামির কাজ ক'রে পায় দশ আনা। সন্ধ্যাবেলায় চাল ডাল কিনে আনে। কিছুকালের মধ্যে পয়সা জমিয়ে সুতো কিনে আনে, তারপর মাছধরা জাল বুনতে বসে। সবাই বলে, ওরা ছুটিতে বেশ আছে। কুন্দ তার বাল্যকালটাকে ভুলে গেছে, ভুলে গেছে তার মায়ের দুঃখদুর্দশার কাহিনী। যে মেয়েটা আম পাড়তে গিয়ে পা ভাঙতো গাছের তলায় পড়ে, মার খেতো পাড়ার লোকের হাতে,—সেই মেয়েটা এই সুখের ঘরের মধ্যে বসে মাঝে মাঝে উসখুস ক'রে ওঠে,—কিন্তু রাজু তাকে সব ভুলিয়ে দিয়েছে। গোলাপী রেশমী শাড়ী পেয়েছে, পেয়েছে কানের মাকড়ি, পেয়ে গেছে হাতের বালা। আর যা পেয়েছে সেও অনবদ্য। একটি ছোট্ট পাতার ঘর, ঘরের বাইরে আনাজ তরকারীর খামার, আর মনের মতন একটি মানুষ। কুন্দ ভুলে গেছে তার মাকে। শুনেছে সে, বান এসেছিল তাদের সেই গাঁয়ে। মা হয়ত বেঁচে নেই। কুন্দ মুখ ফিরিয়ে নেয়। ঘরকন্নায় কুন্দর অভাব কিছুই নেই। রাজুর যখন ঘরবাঁধার কাজকর্ম না থকে, তখন রাজু কাজ নেয় এখানকার কোন্ কামারের এক কারখানায়,—আর কুন্দ যখন বেকার থাকে তখন সেও কাজ

নেয় ধানকলে। রাজুর দেড় টাকা আর তার এক টাকা—দৈনিক আড়াই টাকায় তাদের ঘরে নবাবী আমল। জীবনযাত্রাটায় কোন বিলাস নেই বলেই তাদের পয়সাকড়ি কিছু কিছু উদ্‌বৃত্ত থেকে যায়। কুন্দ সেই পয়সা-কড়িগুলো গচ্ছিত রেখে আসে চৌধুরী গিন্নির কাছে। কুন্দর মিষ্ট ব্যবহারে গাঁয়ের অনেকেই তুষ্ট।

পাঁচটা বছর এমনি করেই কেটে যায়। কিন্তু সুখের মধ্যেও এত অস্বস্তি কেন? বাল্যকালে ভিক্ষা ছিল, অপমান ছিল, অভাব ছিল—কিন্তু অস্বস্তি ছিল না। কুন্দর ধারণা কিছু একটা পাচ্ছেনা, কিছু একটা যেন হারাচ্ছে। বিকালে ফেরে কুন্দ, সন্ধ্যায় ফেরে রাজু। রাজুর মুখে হাসি, ট্যাকে টাকাপয়সা, হাতে খাদ্যসামগ্রী। এক একদিন আনন্দে রাজু নিজেই রাঁধতে বসে যায় এবং রাত্রে শোবার আগে নিজের হাতে কুন্দর নধর হাত পায়ের আঙুলে খয়েরের প্রলেপ লাগিয়ে দেয়। কুন্দর হাতপায়ে হাজা ধরে গেছে।

রাজু বলে, তোকে আর কাজ করতে হবে না, বৌ। যা পারি আমিই ঘর খরচা চালাবো।

কুন্দ বলে, আমি বুঝি ব'সে থাকবো সারাদিন?

ব'সে থাকবি কেন? রান্না করবি, সুতো কাটবি, চুল বাঁধবি,—পায়ের ওপর পা দিয়ে থাকবি। তোর ভাবনা কি?

কুন্দ বলে, এত কাজ করেও সময় আমার কাটে না, আর তুই বলিস ব'সে থাকতে? ও আমি পারবো না। কাজ নিয়েই ত ভুলে থাকি!

রাজু একটু বিস্ময়ের সঙ্গে বলে, কি ভুলে থাকিস,—বল?

না বলবো না।—কুন্দ মুখের ওপর আঁচল চাপা দেয়।

সত্যি বল, তোর দিব্যি। ও কি, বলবার আগেই যে তোর চোখে জল এলো। কেন, বল তো? কেউ কিছু বলেছে?

না।

তবে? সব পেয়েছিস তবু কান্না আসে কেন তোর? আমার কাছে কি কষ্ট পাস?

ছি, ওকথা বলতে নেই রে!—কুন্দ তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে রাজুর মুখে হাত চাপা দেয়। একটু পরে বলে, তোর বয়স বাড়ছে, এর পর ছেলে মানুষ করবি কবে শুনি?

ওঃ এই কথা!—রাজু নিশ্বাস ফেলে।

সেইদিন রাত্রে কুন্দ রাজুকে ধরে বসে, আমি তোর বিয়ে দেবো রাজু, তোর বৌ আনবো!

রাজু বলে, তুই যাবি কোথা?

আমি তোর রেঁধে দেবো, আর তোর ছেলে মানুষ করবো।

রাজু বলে, যদি সে বৌ তোর সঙ্গে ঝগড়া করে?

সে আমাকে মারলেও আমি কথা কইবো না। আমি নিজে তোর জন্যে মেয়ে খুঁজে এনে দেবো।

ঘরে যদি দুরন্ত শিশু না থাকে তবে সে ঘর অসহ্য। সেবছর নূতন ধান উঠতেই রাজু একটি মেয়েকে বিয়ে করে আনলো। কুন্দ চোখের জল লুকিয়ে নূতন বৌকে ঘরে তুললো।

নতুন বৌ-এর নাম কুসুম। সে কুন্দর চুল আঁচড়ে দেয়, রেঁধে খাওয়ায়, জল তুলে আনে। রাত্রে কুন্দ নতুন বৌকে নিয়ে রাজুর ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসে। কুন্দ থাকে বাইরের দাওয়ায়। সামনে খোলা আকাশ। চাঁদের আলো এসে পড়ে পায়ের কাছে। কুন্দর ঘুম আসে না, আসে তন্দ্রা।

আর সেই তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে এক সময়ে অশ্রু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে। মনে পড়ে ছোটবেলাকার গ্রাম, তার বাইরে ধূ ধূ মাঠ—সেই মাঠের উপরে দিগন্তজোড়া চৈত্রের শূন্যতা খাঁ খাঁ করে। সেদিনের সঙ্গে আজকের তফাৎ বোধ হয় কোথাও কিছু নেই।

কিন্তু এই শূন্যকে ভ'রে তোলা দরকার বৈকি। কুন্দ আবার কাজ করতে নামলো। চৌধুরী বাড়ীতে আবার সে বাসন মাজতে লাগলো, এবং ধানকলে আবার সে দিনমজুরী নিল। যে টাকা সে পায়, তাই দিয়ে সে কিনে আনে কুসুমের রাঙাপাড় শাড়ী, হলুদবেড়ের হাট থেকে আনে রাজুর জন্যে মোটা চাদর। তার সঙ্গেই আনে কুসুমের জন্যে একশিশি আলতা।

বছর দেড়েক পরে কুসুমের একটি ছেলে হোলো। কুন্দর বুকের ভিতরকার রক্ততরঙ্গ নেচে উঠলো আনন্দে—এবার তার সব চেয়ে বড় কাজ জুটেছে। ছেলেটা উপুড় হবার আগেই সে গিয়ে এক রঙিন ঝুমঝুমি কিনে নিয়ে এলো।

কিন্তু শিশুর মা সে নয়, একথা জানালো কুসুম। কুসুম বললে, দিদি তোর কাজ তুই নে, আমার কাজ নিয়ে আমি থাকি।

কুন্দ হাসিমুখে বললে, কোন্‌টা আমার কাজ ব'লে দে, তুই ত এখন গিন্নি রে?

কুসুম বললে, তুই রাজুকে নিয়ে থাক্।

কুন্দ বললে, রাজুকে? হাত তুলে যা দিয়েছি তা ত' আর ফিরিয়ে নেবো না।

কিন্তু গাই যেখানে বাছুরও সেখানে মনে রাখিস—এই ব'লে কুসুম সেখান থেকে চ'লে গেল।

কুন্দর চোখ দুটো এবারে দপ ক'রে জ্বলে উঠলো। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে সে ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললে, রাজুকে খয়রাৎ করেছি, ছেলেটা কিন্তু আমার, কুসুম।

কুসুম মুখ বাড়িয়ে বললে, এক গাছের ছাল আর এক গাছে জোড়া লাগে না। বলবো রাজু এলে।

সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে রাজু সব শুনলো। শুনে বললে, এ তোর অন্যায়, কুন্দ। তুই থাক না কেন নিজের মনে? মায়ে পোয়ে থাক না কেন আলাদা!

কুন্দ বললে, এই কি তোর মনে ছিল? তুই না বলেছিলি ছেলে হ'লে আমার কাছেই শোবে?

কুসুম মুখ নাড়া দিয়ে বললে, ছেলে বুঝি বানের জলে ভেসে এসেছে? রাত্তিরে কাঁদলে খাওয়াবি কি?

কুন্দ বললে, সে ভাবনা আমার, তোর নয়!

রাজু বললে, পাগলামি করিস্‌নে, কুন্দ।

কুসুম বাঁকা হাসি হেসে চ'লে গেল।

ঘরের মধ্যে একটা জগৎ—সেটা স্নেহে, প্রেমে, বাৎসল্যে স্বর্গসুধাময়—কিন্তু তার সঙ্গে কুন্দর কোনো পরিচয় হতে পারলো না। বাইরে দাওয়ার নীচে যে জগৎটা সামনের দিকে প্রসারিত—সেটা বুভুক্ষিত বঞ্চিত নারীর পিপাসার মতো। তার লেলিহান রূপ ভয়াবহ। সেখানে সান্ত্বনা নেই, আশ্রয় নেই। প্রকাণ্ড ভুল সেখানে দানবের মত দাঁড়িয়ে—তার ক্ষমাহীন বর্বরতা দেখলে আতঙ্ক হয়। কুন্দ দাওয়ার বাইরে এসে খামারের কোণে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো—তার চোখ দুটো যেন চারিদিকের শূন্য প্রান্তরের মাঝখানে দুটো অগ্নিকুণ্ডের মতো দাউ দাউ ক'রে জ্বলতে লাগলো।

সকাল বেলা উঠে কুসুম আর রাজু যখন কুন্দকে খোঁজাখুজি করছে, কুন্দ তখন অনেক দূরে—ফিরে গেছে তার সেই বাল্যকালে। সেই বাল্যকালের গ্রামে এখন কোনো বসতি নেই। কবে যেন বান এসেছিল তারপর ওলাউঠায় সব নিঃশেষ হয়ে গেছে। কুন্দ তার মাকে খুঁজেছিল, খুঁজেছিল নায়েব মশাইয়ের পড়ো ভিটে। কিন্তু কিছুই খুঁজে পায়নি। মোল্লাদের বাঁশ বাগানের একটা অংশ, আর তার সেই অতি পরিচিত বিলের ধারে প্রাচীন আমগাছটা—এ ছাড়া গ্রামে আর কিছু তার চোখে পড়লো না। কুন্দ হাসিমুখে এগিয়ে গিয়ে হাতড়ে হাতড়ে সেই আমগাছে চ'ড়ে বসলো। এই উঁচুতে উঠলেই দেখা যায় তার সেই মধুর বাল্যকালটা। সেই বাল্যকালে ছিল গৌরব, ছিল সুখস্বপ্ন, ছিল অপরিসীম স্বস্তি।

আমগাছের আগডালের ঠিক নীচে ছিল সেই বিলের জল, সেখানটা চিরদিনই বিপজ্জনক। কুন্দর চুলের রাশি জড়িয়ে গিয়েছিল ডালে—কিন্তু সেই জট ছাড়াতে গিয়ে মড় মড় শব্দে পুরনো ডাল ভাঙলো। কুন্দর ভার সে সইতে পারলো না।

তারপর? ক্ষতবিক্ষত কুন্দ পড়লো বিলের জলে। কিন্তু আজ আর সে আত্মরক্ষা করতে চাইলো না। সাঁতার সে জানে, কিন্তু থাক্। এই জীবনের সব চেয়ে বড় ভুলটা সে আবিষ্কার করবে অতল তলে তলিয়ে গিয়ে। সেখানে খুঁজবে কিছু। অন্ধ নিগূঢ় চিহ্নহীন অতলে গিয়ে সে দেখবে নিজেকে—আজ সাঁতার দিয়ে আর কাজ নেই! এই দেহটা যদি কোনোদিন গলিত অবস্থায় ভেসে ওঠে, তবে চারিদিকের বীভৎস নারকীয় জীবন ধারার সঙ্গে বেমানান হবে না—এইটুকুই কুন্দর সান্ত্বনা!

আত্মাজ্ঞান

হৃদয়াবেগের ভিন্ন নাম হোলো চিত্তদৌর্বল্য। ওটা আমাদের নেই বলেই এ যুগে চাকরী করে অন্নসংস্থান করি। ইন্সপেক্টর চৌধুরী বললে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ওরা যখন কাঁদে, মনের মধ্যে একটু সাড়া পাইনে। বেশী বিরক্ত করলে ইচ্ছে করে ঠাস করে থাপ্পড় লাগাই।

চাটুয্যে বললে, চল্লিশের পর কোনো পুরুষ কাঁদে আগে ভাবতে পারতুম না। সেদিন সেই গোয়ালন্দ এক্সপ্রেসের লোকটা……এই তুমিই ত' ছিলে সেন-সাহেব ?

বললুম, হ্যাঁ, তোমার কথায় হঠাৎ বারুদের মতন জলে ওঠে—

আরে ভাই শোনো ব্যাপারটা। ভেবেছিলুম লোকটা ভিখিরী,—ময়লা কাপড়, ছেঁড়া বেনিয়ন, খালি পা, কোমরে এক ময়লা দুর্গন্ধ পুঁটলী,—কী নোংরা মুখ চোখ! হাউ হাউ করে কাঁদছে আমার পায়ের তলায় পড়ে ;—তার মেয়েটাকে নাকি আনতে পারেনি।—চাটুয্যে বলতে লাগলো, সত্য বলছি ভাই লাথি আমি মারিনি, বোধ হয় ওর গায়ে আমার পায়ের একটা ঠোকা লেগে থাকবে—লোকটা ভাই ফণা তুলে দাঁড়ালো কেউটে সাপের মতন। আমি বললুম, ছাখো, বেশী গণ্ডগোল করো না,—অমন করলে খিচুড়ীও বন্ধ করে দেবো।

লোকটার দুটো চোখে যেন আগুনের কুণ্ড জ্বলছিল। কিন্তু ভাই আমার গা ছম ছম করে উঠেছিল যখন ওর দলের কে একজন বললে, লোকটা নাকি ওদিকের কোন্ কলেজের প্রফেসর। আমি আর পেছন ফিরে তাকাতে সাহস করলুম না।

চৌধুরী জলন্ত সিগারেটের শেষাংশ ফেলে দিয়ে বললে, ক্ষিধের জ্বালায় নেকড়ে বাঘ হন্যে হয়ে ঘুরছে দেখেছিস? দেখেছিস বোশেখ মাসের রোদ্দুরে নেড়ি কুকুর যখন ক্ষেপে উঠে?

চাটুয্যে হাতঘড়ি দেখে বললে, এবার উঠবো, আমার সাতটায় ডিউটি।

ওপাশে চুপ করে ইলেকট্রিক ফ্যান্-এর তলায় বসেছিল আমাদের গজকচ্ছপ হালদার সাহেব। ফস করে সে বললে, চাকরীর মাথায় মারো ঝাড়ু। দু' পয়সা উপরি নেই, কেবল নোংরা ঘাঁটো! ওই খিচুড়ীর সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দাও—একসঙ্গে সব শেষ হয়ে যাক্। অপমানে মাথা হেঁট হয়, আমারই ত' জাত!

চাটুয্যে হাসলো। গজকচ্ছপ এবার চটেছে।

চটবো না?—হালদার চেঁচিয়ে উঠলো—ওরা কি মরতে জানে? জানে শুধু পালাতে। যারা পায়ে ধরে বাঁচতে চায়, তারা পায়ের তলায় থাকে চিরকাল। বলুক না তোমাদের ওই পণ্ডিত সেন-সাহেব!

আমি হাসলুম। হালদারের কপাল বেয়ে ঘাম পড়ছে। তার বিশাল ভুঁড়ি কোনো পাশে হেলিয়েই যেন শান্তি নেই। বুশ-শার্টের নীচের দিকে বোতাম খোলা। এত গরমে পায়ের মোজা জোড়াটাও অত্যন্ত অস্বস্তিকর। কথাটা কিন্তু সত্যি। কান্নায় আমরা টলিনে, অসংখ্য মর্মন্তুদ কাহিনী যখন শুনে যাই, তখন খবরের কাগজের বিবরণ ছাড়া আর কিছু মনে আসে না। ওরাই আমাদের পাথর বানিয়েছে, বানিয়েছে বোবা নিঃসাড় কলের পুতুল। আমাদের কোনো সংশয় নেই, নেই নৈরাশ্য, নেই কোনো ভবিষ্যৎ ভাবনা।

থাক্ বলতে হবে না—হালদার তার স্থূল গ্রীবার উপরে ঘামে ভেজা রুমাল ঘষতে ঘষতে বললে, কিন্তু ভাই আমার সঙ্গে মিলবে না তোমাদের। ধাপার মাঠে ময়লার গাড়ী ওল্টাতে দেখেছ? সারাদিন নাকে কাপড় বেঁধে ষ্টেশনে ঘুরতে কেমন লাগে? এক একখানা ট্রেন এসে ঢেলে দিয়ে যাচ্ছে হাজার হাজার ময়লা জীব। দেখেছ তাদের মুখ চোখের চেহারা? কথা নেই, ভাষা নেই, রক্ত নেই, প্রাণ নেই—

নাঃ চাটুয্যে হেঁকে উঠলো, হালদারকে নিয়ে আর পারা যায় না,—একখানা আমলেট্ আর এক পেয়লা চা চলবে?

গজকচ্ছপ এবার ফিক করে হেসে বললে, তুই খাওয়াবি,—মাইরি? পেটে কিছু পড়লেই মেজাজ ঠাণ্ডা হয়, বুঝলি?—আরে, এই যে মিষ্টার মিলিটারী, এসো ভাই বড় কুটুম্ব!

মিলিটারী ওরফে দীনেশ গোঁসাই এসেই অমনি চায়ের অর্ডার করলো। বললে, চা ছাড়া কিচ্ছু খেয়ো না, আবার কলেরা ব্রেক-আউট করেছে! সাবধান!

কোথায়? ক্যাম্পে?

না হে, এখানেই। আজ বিকেলে পর পর ছ'টা। একটাও নেই।

ব্রাভো!—হালদার লাফিয়ে পাশ ফিরলো। বললে, সুসংবাদ! ঈশ্বর সত্যিই আছেন। বেশ মহামারী ত? কেমন বুঝছ, মিলিটারী?

তোমার এত আহ্লাদ কিসের?

হবে না? এই ত' একটা প্রতিকার! যত কমে যায়, বুঝলে? কেউ ত' বাঁচবে না রে—তার চেয়ে এই বেশ। একসঙ্গে শেষ হওয়া!

আমলেট্ আর চা এসে হালদারের সামনের টেবিলে হাজির হোলো। কিন্তু তার স্থায়িত্ব কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। কাঁটা আর চামচে সরিয়ে রেখে

বিরাট মুখব্যাদান করে গজকচ্ছপ সেই আমলেট্ মুখে পুরে দিল। পরে বললে, যা আর একটা নিয়ে আয়৺—ষ্টেশনে কিছু খেতে রুচি হয় না। কি দেখছ হে, সেন পণ্ডিত ?

হেসে ফেললুম, বললুম, তোমার কলেরার ভয় নেই ?

খেতে না শিখলেই কলেরা হয়, বুঝেছ ? আর আমার যদি হয়, হালদার গুষ্টি রইলো ! কিন্তু কি জানো ভাই, বাঁচতে আর ইচ্ছে নেই ! দিনের বেলা চাকরী করে যাই—আর রাত্রে এই দৃশ্যগুলো দেখি স্বপ্নে…… ডরিয়ে উঠি !

তোমার পেট গরম হয় নিশ্চয়ই !

হয় ! পেট গরম, মাথা গরম—সবই হয় ! কি জানিস ভাই, এ আর সয় না। যা হয় হোক,—একটা মস্ত ভূঁইকম্প, একটা জলপ্লাবন,—আর নয়ত একটা মড়ক।

তা'তে কি সুবিধে ?

সুবিধে এই, উপস্থিত কালের ইতিহাসটা একেবারে মুছে যায় !

হেসে বললুম, আহা, কি তোমার জনকল্যাণের আদর্শ !

সহসা বাইরে ষ্টেশনের ঘণ্টার শব্দ শোনা গেল। আসাম মেল আসছে। চৌধুরী ছুটে বেরিয়ে যাবার আগে বললে, এম্বুলেন্সের সিগনালটা দিয়ে দিয়ো।

সে চলে যাবার পর গজকচ্ছপ বললে, আমিও যাই। গাড়ী এসেছে, এবার ঢেলে দিয়ে যাবে হাজার হাজার নোংরা মেয়ে পুরুষ। দেখিস তোরা, চাকরী ছেড়ে পালাবো একদিন।

ট্রেণ এসে থামলো। আবার একটা সরগোল। তারপরে সব চুপ, —নিঃঝুম। ক্বচিৎ একটা আর্তকণ্ঠ বা কোন্ শিশুর কাতরোক্তি,—

তারপর মৃত্যুর মতো অসাড়। চারিদিকে জনসমুদ্রের কল্লোল, কিন্তু মানুষের ভাষা নেই কোথাও। কথা নেই, শুধু অন্তহীন কলরব।

বাইরে সরকারী মোটর লরী এসে দাঁড়ায়। তার ড্রাইভার কাগজ-পত্র পরীক্ষা করে। আশ পাশে দাঁড়িয়ে যায় সশস্ত্র পুলিশ আর সেপাই। তারপর ঘোষণা শোনা যায় কোনো একখানের ক্যাম্পের নম্বর। কেউ কেউ বা টর্চের আলো জেলে লরীর আরোহীদের পরীক্ষা করে নেয়। তারপর লরী ছাড়ে। কোথায় উধাও হয়ে যায়।

ওই টর্চের আলোয় যা দেখা যায় তাও প্রাত্যহিক, নিত্যনৈমিত্তিক। ওই লরীতে বসতে পারে জন কুড়ি, কিন্তু নেওয়া হয়েছে জন-পঞ্চাশেক। টর্চের আলোর হঠাৎ দেখে নিতে হয় তাদের মুখ। অসংখ্য মেয়ে পুরুষ আর শিশু। কিন্তু সে সব মুখ বোবা, চোখের তারায় আর রেখায় কোনো সজীবতা নেই,—আতঙ্কপাণ্ডুর, হতবাক্‌, মনুষ্যত্ববর্জিত, অপমানাহত—সেই সব বীভৎস ক্ষণকালীন ছবি। রাষ্ট্রবিচ্ছেদের দেশব্যাপী অগ্নিকুণ্ডে ওদের জ্বালানি কাঠের মতো ব্যবহার করা হয়েছে; ওরা জলে পুড়ে কালো হয়ে গেছে। দুর্ভিক্ষে, বিপ্লবে, অরাজকতায়, সর্বব্যাপী হিংস্রতায়—চিরদিন যারা মার খেয়ে এসেছে, ওরা তারাই,—টর্চের আলোয় সে কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কিন্তু এটা আমাদের মনোবিকলন, অনেকটা ঠিক যেন সাময়িক বিভ্রম! চাটুয্যে চেঁচিয়ে বললে, মাথা গুণলুম, আটশোর ওপর। উঁচু নীচু সব সমান। কেউ জমিদারের বেটি, কেউ মেচুনি, ষ্টীমরোলার চালিয়ে সবাইকে সমান করা হয়েছে। থাকো সবাই একখানে, শ্রীক্ষেত্রের অন্ন খাও। ওই ভীড়ের মধ্যে একজন বলে, পালিয়েই না হয় এসেছি, জাত ত' আর যায়নি। ও মেয়েটা আমাদের গাঁয়ের বারুইদের, ওর পাশে ব'সে

মুড়ি-চিঁড়ে খাবো না। আর বুঝলে ভাই সেন পণ্ডিত, কাল একটা বোকে দেখে প্রায় আঁৎকে উঠেছিলুম! হঠাৎ বোঝা যায় না যে, সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে। লাল পেড়ে শাড়ী, লাল চোখ, লাল চেহারা,—কিন্তু চেনবার যো কি, ধুলোয় কাদায় নোংরায় আর অপমানে—কী ময়লা! কিন্তু তবু কালো কয়লার ভেতর থেকে যেন হীরে জ্বলছে, এমনি দুটো চোখ! বিপ্লবের আগুন যেন ধক্ ধক্ করছে ললাটের নীচে। আমার দিকে তাকালো, যেন সব অপরাধ আমারই, আমিই দায়ী,—যেন স্বাধীনতা আর ক্ষমতা পাবার লোভে লক্ষ লক্ষ সুখের ঘরকন্নায় আমিই আগুন জ্বালিয়েছি! ভয়ে ভয়ে আমি পালিয়ে গেলুম ভাই বৌটার কাছ থেকে।

চাটুয্যে এক সময় বেরিয়ে চলে গেল।

এম্বুলেন্সের সিগনাল আমি দিয়েছি, কিন্তু অপেক্ষা করছিলুম আমাদের ক্যাম্পের লরীর জন্য। দু'খানা গাড়ী এসেছে, ভীড় জমে গিয়েছে প্লাটফরমে। সে জনতা নীরেট, অচল—জন-জীবনের অসাড় বদ্ধজলার মতো। বুকের মধ্যে যেন গুরু গুরু আঘাত ধ্বনিত হতে থাকে। আমি গিয়ে দাঁড়ালুম এক প্রান্তে।

অদূরে চেকিংয়ে ব্যস্ত ছিল গজকচ্ছপ হালদার। বেচারী মোটা মানুষ, এত গরমে কোটপ্যাণ্ট তার পক্ষে অসহ্য। আমি গিয়ে তার পিছনে দাঁড়িয়েছি সে বুঝতে পারেনি। বিশাল জনস্রোতকে সে গুণছে একটির পর একটি। দরদর করে ঘাম পড়ছে কপাল বেয়ে, কোটের পিঠের দিকটা ভিজে থক থক করছে। কিন্তু ওই অবিশ্রান্ত গণনার মধ্যেও সে তার হিংস্র দুই দাঁতের পাটি চেপে বিড়বিড় করে গালি দিচ্ছে। কাকে কটূক্তি করছে বুঝিনে, অথচ অসীম আক্রোশের সঙ্গে সে বলছে, ড্যাম্ রট্! ম'রে যা, ম'রে যা,—ছশো সতের, আর নয়ে ছাব্বিশ, আর

পাঁচে একত্রিশ, আর আটে উনচল্লিশ আর বারোয় একান্ন...মরে যা, ...কলেরা, টাইফয়েড, টি-বি, স্মলপক্স...মরে যা...মরে যা...আর তেরোয় চৌষট্টি—ভারমিনস! ঈশ্বর আছেন, না নেই! নেই, নেই, নেই...আর নয়ে তিয়াত্তর......

সেখান থেকে সরে গেলাম। এর পরে উত্তেজনার মুহূর্তে হঠাৎ যদি আমাকে দেখতে পায় তবে আর রক্ষা নেই। তার মুখে কিছুই আটকায় না।

ফিরে এসে কেবিনে ঢুকবো এমন সময় জুনিয়র এসে খবর দিল, আমাদের লরী-কনভয় এসে পৌছেছে! তখন রাত প্রায় আটটা বাজে।

সেপাইরা এসে লরীগুলো ঘিরে দাঁড়ালো। আমি ড্রাইভারের কাগজপত্র পরীক্ষা করে নিলুম। তিন নম্বর এন্‌ক্লোজার দিয়ে বেরিয়ে আসছে মূঢ় নরনারী আর শিশুর জনতা। স্বেচ্ছাসেবকরা এগিয়ে গিয়ে এক একটি লরী বোঝাই করতে লাগলো। শীর্ণকায়, অর্ধনগ্ন, উপবাসী, মানহারা নরনারী—সেই একই মুখ, একই শ্রেণী, একই নিরুপায় ঘৃণা চোখে মুখে। বৈচিত্র্য নেই, ব্যতিক্রম নেই—যা দেখে এসেছি এতদিন, যা দেখবো এর পরেও। ভাগ্যক্রমে ওপর-তলায় উঠে গেছে সবাই, ওরা পড়েছে নীচের দিকে। টর্চের আলোয় দেখা যায়, অখ্যাত অজ্ঞাত কুলশীল পরিচয়হীন জনতা—ওরা এ যুগের অপযশ অভিশাপ আর অনাদর বহন করে নিয়ে যাবে যুগান্তরে। ভিখারীর সংখ্যা বাড়বে, বঞ্চিতের চিত্ত-গ্লানিতে বিষবাষ্প ঘুলিয়ে উঠবে দেশের আবহাওয়ায়,—ক্ষুধাতুর ব্যথাতুর শোকাতুরের বুকের রক্তের থেকে জন্মগ্রহণ করবে সর্বনাশা বিপ্লববাদ। সেই অবশ্যম্ভাবী সংহার শক্তির মৃদু দুন্দুভির আওয়াজ ওদের ওই ভগ্নজড়িত কণ্ঠে এখনই শোনা যায়।

ভিড়ের ভিতর থেকে হঠাৎ একটি মেয়েছেলে চেঁচিয়ে ওঠে। বলে, না, ওকে একলা ছেড়ে দেবো না,“ওকে দাও আমার কাছে—ওকে দাও, ওকে নিয়ো না আমার কাছ থেকে। বিরক্ত হয়ে বললুম, কাকে? কাকে চাও?

ছেলেটাকে আমার কাছে দাও—ও দুরন্ত ছেলে!

নয় দশ বছরের একটা কদাকার কালো ছেলের হাত ধরে মেয়েটি আবার বললে, বিদেশ বিভুঁই—ও কেন যাবে ভিন্ন গাড়ীতে—

স্বেচ্ছাসেবকরা হৈ চৈ করে উঠলো। মেয়ে বোঝাই লরীতে কেবল মেয়েরাই যাবে, কোলের শিশু ছাড়া এক লরীতে পুরুষের যাবার হুকুম নেই। আঃ, তুমি চেঁচিয়ো না বাপু, এখানকার আইন-কানুন মেনে চলতে হবে। ও তো তোমার সঙ্গেই যাচ্ছে পিছনের গাড়ীতে, অত হাঁক-পাঁক করো কেন?

মেয়েটি বললে, হারালে খুঁজবে কে?

হারাবে কেন? সাহেব ত সঙ্গেই আছেন! ওহে ও ছেলে, তোমার নাম কি?

ছেলেটা কাঁদো কাঁদো মুখে বললে, হাবু সেন।

মেয়েটি বললে, আমার পাশে থাকলে হয়েছে কি? ওকি অন্য মেয়ে নিয়ে পালাবে?

সহসা যেন চাবুকের সপাং শব্দে সচকিত হয়ে উঠলুম। সে যেন সাপের ফণা। একটু ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললুম, মেয়েছেলের মুখে এ সব কথা ভালো নয়। একটা নিয়ম ত আমাদের মেনে চলতে হবে!

এটা কোন্ নিয়ম, মায়ের কাছ থেকে ছোট ছেলেকে সরিয়ে রাখা?

বেশী বাক-বিতণ্ডা করা মিথ্যে। হাতে সময়ও ছিল কম। পুরুষের গাড়ীতে হাবু সেনকে তুলে দিতে বলে আমি কনভয় ছাড়বার হুকুম দিলুম। মেয়েটা অনেকক্ষণ পর্যন্ত গজ গজ করতে লাগলো।

বেলেঘাটার সাত নম্বর তাঁবুর ধারে যখন এসে পৌছলুম, হাত-ঘড়িতে দেখি তখন রাত নয়টা বাজে। লরীর থেকে সবাই যখন নামলো তখন খাবার ঘণ্টা পড়ে গেছে। প্রায় সাত হাজার লোকের জটলা। সেই জটলা পেরিয়ে অন্যত্র গিয়ে শেষের লরী দুখানা থামলো। আমার মনেই ছিল না হাবু সেন থেকে গিয়েছে শেষের লরীতে। ওই বিশাল জনতার ভিতর থেকে এক সময়ে হাবুর মায়ের উচ্চ দীর্ঘ কণ্ঠ শোনা গেল, হাবুকে নাকি সে খুঁজে পাচ্ছে না। কিন্তু জনতার ভিড়ে ও কল-কোলাহলে হাবুর মার গলার আওয়াজ চাপা পড়ে যাচ্ছিল।

ক্যাম্পের বাইরের আলোগুলো হঠাৎ নিবে গেল। তাতে একটা বিপর্যয় বাধলো বটে, কিন্তু এমন কিছু দুর্ভাবনার কারণ ছিল না। এ রকম ঘটনা প্রায়ই ঘটে।

হাবুর মা বাইরের অন্ধকারে যখন এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি বৎসহারা বাঘিনীর মতো ছুটোছুটি করছে, সেই সময় সহসা জনতার ভিতর থেকে হাবুর উচ্চ কণ্ঠ শোনা গেল, আম্মাজান—ও আম্মাজান ?

হাবুর মা প্রায় পাগলের মতো ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে হাবুকে জড়িয়ে ধরে বললে, এই যে বাবা—এই যে—

আম্মাজান।

সহসা তড়িৎস্পর্শে সেই বিশাল জনতা হতচকিত। আম্মাজান!—এ কোন্ ভাষা? এ ভাষা কাদের? আমিও মূঢ়ের মতো মেয়েটার দিকে তাকালুম। এবারে আলোগুলো জ্বলে উঠেছে।

একদল লোক এসে মাতা ও পুত্রকে ঘিরে দাঁড়ালো। একজন ছেলেটার হাত ধরে বললে, তোর নাম কি? সত্যি বল। কেউ প্রশ্ন করলো, তোদের দেশ কোথা বাছা?

মেয়েটি জবাব দিল, মুন্সীগঞ্জ।

স্বামীর নাম কি?

অঘোর বোরেগী।

এ ছেলে কার?

যার ছেলে তার? এ আবার তোমাদের কোন্ কথা?

জন দুই লোক এগিয়ে এসে ছেলেটাকে চেপে ধরলো। সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্ন করলো, ও তোর মা? তুই কোন্ জাত?

হাবু বললে, কইতি পারুম না।

ছাড়ো বাছা তোমরা। মেয়েটি ধমক দিল, জাত আবার কি? গায়ে বুঝি জাত লেখা আছে? থাকবো না আমরা এখানে—চল্ অন্য জায়গায় যাই, হাবু।

কিন্তু আশ-পাশের লোকগুলি নাছোড়বান্দা। তারা ধরে বসলো, তোর আসল নাম কি বল্?

ছেলেটা কাঁপছিল। তবু ভীত আর্তকণ্ঠে বললে, আবু হোসেন!

ঘটনার চেহারাটা মন্দ পথে যেতে পারে এজন্য এক সময়ে ওদের দুজনকে বার করে নিয়ে এলুম। আশঙ্কা ছিল আমার মনে মনে।

বারুদে আগুন লেগে হঠাৎ বিস্ফোরণ হতে পারে। কিছুদূর এসে বললুম, তোমার নাম কি, বলো ত? সত্যি কথা বলবে!

মেয়েটা এবার নির্ভয়ে আমার দিকে তাকালো। এবার আমিও তাকে ভালো করে লক্ষ্য করলুম। বয়স আন্দাজ ত্রিশের মধ্যে। বললে, আপনাদের খুব উঁচু মনে করিনে যে, ভয় পেয়ে মিছে কথা বলবো। আমার নাম মাধু।

আবু হোসেনকে সঙ্গে এনেছ কেন?

ওকে আমি মানুষ করেছি। আমি ওর মা।

তুমি জানো এতে কত বিপদ?

আপনি যদি বিপদে না ফেলেন তবে কোনো বিপদ নেই!—মাধু স্পষ্ট চক্ষে তাকালো।

আমি বললুম, কিন্তু ওকে ছেড়ে দিতে হবে এক্ষুণি।

মাধু বললে কেন?

ওকে ওদের পল্লীতে ভালো জায়গায় রেখে আসবো।

আমার চেয়ে ভালো জায়গা ওর কোথায়?

চুপ করে রইলুম কিছুক্ষণ। আজ রাত্রেই যদি এর কোনো ব্যবস্থা করে না যাই, তবে কাল আমার চাকরি যাবে। পরে বললুম, টান যদি এতই বেশী, তবে পালিয়ে এলে কেন?

মাধুর মতো মেয়ে এ কথার জবাব যেভাবে দিল তাতে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। সে বললে, ভয়ে! কেবল ভয়ে! সেখানেও ভয় দেখায়, এখানেও ভয় পাওয়ায়। সেটাও মগের মুলুক এটাও মগের মুলুক। মরদের দেশ কোনোটা নয়। সেখানে মার খেলে কেউ

নালিশ শোনে না, এখানেও না খেয়ে মরলে কেউ দেখেনা। এই ত আজ ন'দিন হোলো ইষ্টিশানে প'ড়ে ছিলুন—

আলোচনার সময় আমার হাতে নেই, অবিলম্বেই এর নিষ্পত্তি করা দরকার। নতুন দলের চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে আমাকে বেরিয়ে আসতে হোলো। মাধুকে নানাপ্রকারে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু সে কোনো কথাই কানে নিল না। সুতরাং আমাকে টেলিফোন ক'রে অন্য লোক আনতেই হোলো। এ দায়িত্ব আমি একা নিতে পারিনে।

মাধুর শত কান্নাকাটি সত্ত্বেও একপ্রকার গায়ের জোরে আবু হোসেনকে নিয়ে দুজন লোক চ'লে গেল। মাধু অন্ধকারে সেইখানে একা দাঁড়িয়ে আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছতে লাগলো।

ছেলেটা যেতে চায় না, তা'কে হিঁচড়ে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চলেছে। নাবালক বুঝতে চায় না, এখানে তাকে রাখলে তারই বিপদ। গলি-পথটা পেরিয়ে বড় রাস্তায় প'ড়ে একজন স্বেচ্ছাসেবক তাকে বুঝিয়ে বলতে লাগলো, আচ্ছা, এখন চল্, কাল তোকে এনে দেবো তোর মা'র কাছে। কিন্তু খবরদার, ফিরে এসে যেন নিজের নাম বলবিনে কোথাও। চল্, কোনো ভয় নেই। তোদের পাড়ার ক্যাম্পে বেশ ভালো থাকবি।

মাইল দেড়েক পথ। আলোকমালা সজ্জিত রাজপথের উপর দিয়ে জনতার জটিলতা পেরিয়ে হাবুকে নিয়ে ওরা চলেছে নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে। কিন্তু সেটা যে নির্বাসন, এটা বাৎসল্য-বুভুক্ষিতা মাধুও যেমন বছরের নাবালকের পক্ষে এর চেয়ে বড় আকর্ষণ আর কিছুই ছিল না। জানে, মাতৃবিচ্ছেদাতুর হাবুও তেমনি অনুভব করে। সংসারে নয়

সমগ্র দেশের অপমানজনক রাষ্ট্রব্যবস্থার বাইরে যিনি মহাকালের দেবতা, তিনি এই রাত্রিকালে ওই শ্রান্ত-ক্লান্ত ক্ষুধাতুর বালকের অশ্রু-সজল কাতরতার মধ্যে জেগে রইলেন।

পার্কসার্কাসের পূর্বপ্রান্তের এক পল্লীর তাঁবুর মধ্যে যখন হাবুকে আনা হলো, তখন সহসা পিছন থেকে ছুটে এসে মাধু হাবুকে আবার জাপটে ধরলো। স্বেচ্ছাসেবকদের চালক ত' হতবাক! মাধু যে এই দীর্ঘ পথ ছায়ামূর্তির মতো অনুসরণ ক'রে এসেছে, একথা তা'রা কল্পনাও করেনি। একজন বললে, তুমি ছেলেটাকে বাঁচতে দেবে না, কেমন?

মাধু হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, যদি মরে আমার কোলেই মরুক।

তুমি এ তাঁবুতে এসেছ তোমার ভয় নেই?

হাবুকে ফিরে পেয়ে মাধু খুশী হয়েছিল। এবার বললে, ভয় কিসের? তোমরা বুঝি সবাই জন্তু-জানোয়ার?

আমি বললুম, এক কাজ করা যাক্, শোনো হে—ওদের বারো নম্বর ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া যাক্—সেখানে গিয়ে যদি ছেলেটার নাম চেপে রাখ তবে যা হোক ক'রে একটা সপ্তাহ কাটানো যাবে।

সেই ভালো স্যর।

বললুম, বারো নম্বরে আমাকেও আজ থাকতে হবে। ওগো, এসো আমাদের সঙ্গে। কিন্তু সাবধান, ছেলেটার পরিচয় চেপে রেখো।

দাঁত বা'র ক'রে যেন তোমাকে আম্মাজান ব'লে ডাকে না! যত জ্বালা!

অন্ধকারে তাঁবুর ভিতরটা দেখা যায় না। শত শত লোক প'ড়ে রয়েছে, যেন অসংখ্য অচেতন মৃতদেহ। দরজার পাশেই ছোট একটি ক্যাম্বিশ মোড়া ঘর, সেখানে একটি খাটিয়া পাতা,—ওর মধ্যেই আমাকে রাত কাটাতে হবে। অন্য কোনো জায়গা নেই। রাত অনেক হয়েছে। কাল সকালে আমার ডিউটি বদলে যাবে। গায়ের কোটটা খুলে আমি পাশেই রাখলুম। এবার একটু ঠাণ্ডা বাতাস দিয়েছে।

এ তাঁবুতে ছোট ছোট শত শত পরিবার আশ্রয় নিয়েছে। এরা নানা জেলার, নানা গ্রামের। শুয়ে রয়েছে পাশাপাসি, গায়ে গায়ে। ওর মধ্যে আছে শিশুর কান্না, সীমানা নিয়ে বাকবিতণ্ডা, হায়-হুতাশ, আত্মগরিমার মিথ্যা গল্প,—এবং আরো যেসকল নীতিবিগর্হিত ছোটখাটো ঘটনা ঘটে তার আলোচনা না করাই সঙ্গত। যে সকল ছেলেমেয়েরা সাবালক, তাদের মা-বাপের চোখে নিশ্চিন্ত নিদ্রা আসে না। নিগৃহীত ও উৎপীড়িত মনুষ্যত্ব এখানকার এই অস্বাভাবিক এবং নিয়তিনির্দিষ্ট আবেষ্টনের মধ্যে এসে অধোমুখী প্রবৃত্তির রাশ আলগা ক'রে দিয়েছে। সে দৃশ্য পদে পদে আমাদের চোখে পড়ে।

সহসা ঠিক পাশ থেকেই একটা চাপা গলার স্বর কনে এলো। নিঃশ্বাস রোধ করা সে ভগ্নকণ্ঠ কান পেতে শুনলাম। বলছে, শুনতে পাও? অসুরের পায়ের শব্দ? এগিয়ে আসছে অনেক নীচের থেকে মশাল হাতে নিয়ে! দাঁত দিয়ে ছিঁড়বে, নখ দিয়ে ফেড়ে ফেলবে!

ছেঁচা বাঁশের বেড়ার এপাশে থেকে আমার শরীর যেন রোমাঞ্চ হয়ে এলো। রাত ঘন গভীর। কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল,—আগুনে আর রক্তে ভেসে যাবে সব! কিন্তু.....কিন্তু আমি......না, কিছু না,—শুধু ফাঁকি, জোচ্চুরি, ভণ্ডামী,—শুধু লাভ দেখিয়ে ওরা ঠকিয়েছে আমাদের। শুধু চিরকাল ধ'রে মারছে আমাদের!

আঃ এবার থামো—একটু ঘুমোতে দাও।—চাপা নারীর কণ্ঠ পাশ থেকে বলে ওঠে,—ভগবান, এ আর সহ্য হয় না!

হয়, সহ্য হয়! ভগবান......নেই, নেই—শুধু ঘৃণা করি তাকে, ঘৃণা করি দেশকে, সবাইকে, সব ব্যবস্থাকে! কী নোংরা......কি দুর্গন্ধ......শুধু পচা মড়া!

পুরুষের কঠোর চাপা কণ্ঠের সেই কঠিন বিদ্বেষ ও হিংস্র নিশ্বাস বোঝানো কঠিন। আমি আস্তে আস্তে উঠে এধার থেকে ওধার পর্যন্ত পায়চারি করতে লাগলুম।

আবার চাপা আওয়াজ পেলুম,—বলে যাবো, যাবার সময় বলে যাবো—পাপ করিনি, তবু শাস্তি পেলাম। ব'লে যাবো, অপরাধ জানতে পারলাম না, তবু মার খেয়ে গেলাম! কেন মারলে? কেন দিলে না বাঁচতে? উত্তর নেই!

কে?

হঠাৎ অন্ধকারে দেখি একটা লোক ভূতের মতো দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে চুপ ক'রে বসে রয়েছে। প্রায় চমকে উঠেছিলুম। বললুম, কে ওখানে?

টর্চের আলো ফেলতেই লোকটা মাথা তুললো। দৃষ্টিটা শূন্যে কিন্তু চোখ দুটো টকটকে লাল। মাথায় কাঁচা পাকা ঝাঁকড়া চুল, পরণে ছোট একখানা কাপড়।

কাছে এসে বললুম, এখানে বসে কেন ?

বুঝলুম লোকটার মুখের ভিতর থেকে একটা আওয়াজ বেরুচ্ছে, চোখে জল নেই, তবু কাঁদছিল।

বললুল, বাড়ী কোথায় ?

বাড়ী !—লোকটা হঠাৎ কঠিন করাল চক্ষে আমার দিকে তাকালো। ঘোরালো দৃষ্টি হিংসায় ও বিদ্বেষে যেন দপ দপ ক'রে উঠলো। সে পুনরায় বললে, বাড়ী আমার বাংলায় !

কে আছে তোমার সঙ্গে ?

কেউ নেই, আপনি যান্ আপনার কাজে।—লোকটা আবার দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে ব'সে জড়িতস্বরে কি যেন বিড়বিড় করে বকতে লাগলো। আমি আর সেখানে দাঁড়াতে সাহস করলুম না। অন্যদিকে এগিয়ে গেলুম।

রাত্রে একবার পরিদর্শন ক'রে আসাটাও আমার কাজেরই একটা অঙ্গ। দক্ষিণ দিক দিয়ে ঘোরবার সময় হঠাৎ পাশ থেকে আবার চাপা আওয়াজ পেয়ে একবারটি থমকে দাঁড়ালুম।

আম্মাজান ?

আঃ চুপ কর মুখপোড়া—

রাত তিন পহর হইছে,—তোর চোখে ঘুম নাই ক্যান্ আম্মাজান ?

আড়ষ্ট হয়ে উঠলাম। ছেলেটা বুঝিবা এবার সর্বনাশ বাধায়। আতঙ্কে আমার সর্বশরীর কেঁপে উঠলো। কিন্তু আমার পক্ষে আর

কিছু করা সম্ভব নয়, আমি বড় ক্লান্ত। যাই ঘটুক না কেন, আমি আর বাধা দেবো না।

ম্াধু বললে, ভাবছি তোরে লইয়া যামু ক'নে।

ঘরে ফিরবি না?

ঘর! ঘর জ্বালাইয়া দিসে, মনে নাই?

হ দিসে। আর নফরালি যে কইলো, মা ঠাকরেণ, পায়ে ধরছি, ঘাট মানছি,—গাঁ ছাড়িয়া যাইয়ো না। তোমার লগে তিন দিনে নতুন ঘর বানাইয়া দিউম? কইছে কি না?

হ, কইছে বটে।

আবু হোসেন পুনরায় চুপি চুপি বললে, ও বেইমানরে বাপ বলিয়া ডাকুম ক্যান্, বলতো?

মাধু জবাব দিল, ছি, বলতে নাই! তোরা সবাই আমার ছাওয়াল। ওর জ্ঞানগম্যি নাই, তাই রিষা কইরা তোরে তাড়াইসে।

আবু আবার কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, এ ঠাঁই ভালো না। গাঙ নাই, ক্ষ্যাত নাই, খামার নাই,—খামু কি?

আবার দুজনে চুপ।

আম্মাজান!

ক্যান্?

আমাগো লাউডগায় ফল ধরছে এদ্দিনে, না?

হ।

আর সবড়ি কলা? খামারে উসত্যা? আমে পাক ধরছে নয়? চল্ আমরা ফিরে যাই।

মাধু বললে, ফিরে গিয়ে কি করবো?

বিলে মাছ আছে, খামারে সব্জি,—হাটে বেচবো গিয়া। আমি পাট খাটবো তোর লগে। যাবি ফিরে ?

গেলে যদি মারে ?

মারবে কোন্ হালার পো ? তোর লগে আমি জান দিমু। দেখিয়া ল'স।—চল্ ফিরে যাই, আম্মাজান।

মাতা ও পুত্রের কথালাপ যেন অমৃতবাণী বহন ক'রে আনছিল। উপরে শান্ত ও অনন্ত কালো আকাশ নক্ষত্রখচিত কিন্তু ওই অন্ধকারেও আশ্বাসের সঙ্কেত যেন খুঁজে পাওয়া যায়। এই ধূল্যবলুণ্ঠিত অপমান-শয্যায় শুয়ে ওরা কান পেতে রয়েছে সেই মাটির নীচে,—যে মাটির সঙ্গে ওদের চিরকালের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। আলো-বায়ুহীন রুদ্ধশ্বাস ক্যাম্পের বাইরে ওরা চেয়ে রয়েছে সেইদিকে—যেদিকে দিগন্ত বিস্তার শস্য-শ্যামলতার প্রাচুর্য, যেদিকে মমতা ও করুণ স্নেহের ইসারা,—সমস্ত মন-প্রাণ যেদিকে সান্ত্বনার আশ্রয় খুঁজে ফিরছে। ছোট্ট পাতার কুঁড়ে, নগণ্য গৃহসজ্জা, দু'চারটি সব্জির চারা, একটুখানি গৃহাঙ্গন, নফরালির কাতর আহ্বান—মা ঠাক্‌রেণ—আর হৃদয়ের সুর দিয়ে মেলানো সামান্য জীবন ধারার মাধুর্য,—ওরা চেয়ে রয়েছে সেই দিকে।

আম্মাজান ?

মাধু চাপা কণ্ঠে জবাব দিল, চল্ তাই যাবো, কোনো ভয় নেই! কাল ভোর বেলা উঠেই যাবো ইষ্টিশানের দিকে, কিন্তু চুপি চুপি,—কেউ না টের পায়, বাবা।

আবু বললে, আমি তোরে পথ দেখাইয়া লয়্যা যামু, আম্মাজান! পথ আমি চিনি।